KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection: KLMLGK	Publisher: বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title: পত্রিক	Size: 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5-6	Year of Publication: ভাদ্র, ১৩৮৪ আশ্বিন, ১৩৮৪ কার্তিক, ১৩৮৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪ পৌষ-মাঘ, ১৩৮৪
	Condition: Brittle / Good
Editor: বিক্রম মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় রায়	Remarks:

C.D. Roll No.: KLMLGK

সূচীপত্র

পুরোনো লেখক— প্রমথ চৌধুরী	১
গদ্য-কবিতা (গল্প)— প্রবোধ কুমার সান্যাল	৩
প্রগতি— নলিনীকান্ত গুপ্ত	১১
সম্পাদকীয়	১৩
আধুনিকতা ও য়ুরোপীয় চিত্রকলা—জ্যোতিরিন্দ্র রায়	১৭
অঞ্জন (গল্প)— আশাপূর্ণা দেবী	২৫
হৃদয়ের পত্র— সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩২
একটি কবিতা— জীবনানন্দ দাশ	৩৪
দিন ও রাত্রির কবিতা— বিরাম মুখোপাধ্যায়	৩৭
বিচ্ছেদ— সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	৩৯
লেবুদের একটি কবিতা— হুমায়ুন কবির	৪০
কড়ের আকাশ (উপন্যাস)— বিশ্বনাথ চৌধুরী	৪১
পাঁচুদের ঘাট (গল্প)— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯
মার্কসবাদের গোড়ার কথা ও হেগেলীয় ডায়ালেকটিক —হীরালাল দাশগুপ্ত	৫৫
পলায়ন (গল্প)— রঞ্জন সেন	৫৯

প্রয়োজনের সময়ে

আমাদের বালতি, কড়া, কুঁজো, পেরেক ও অন্যান্য যাবতীয় লোহার জিনিষ ব্যবহার করিয়া আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হইবেন।

প্রত্যেকটি জিনিষ স্থায়িত্বে ও সুলভতায় অতুলনীয়।

মনিলাল কৃষ্ণলাল এণ্ড কোং

৩১, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড

(জগুবাবুর বাজার) কলিকাতা।

নিত্য নূতন অলঙ্কারের জন্য

মিত্র মুখার্জ্জী কোং

৩০, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড

ভবানীপুর কলিকাতা

9ct. GOLD CURB CHAINS
& Platinum Neck Chain 16"

9CT. GOLD (SNAPS)

9CT. GOLD (BOLT RINGS)

Write for Price List—
K. L. KARMOKAR
13-1, Chidum Mudy Lane,
P.O. Beadon Street, Calcutta.

KARMAKAR'S

Machine-made Curb Chains

Satisfy most Fastidious

Taste

Last the Longest

Decent, Well-Finished

Price : Moderate

PHONE: B. B. 5506.

Ujjala SNOW —Apply for Agency
Swadeshi Silpashram,
73-B, Durga Charan Mitter St. Calcutta.

Confidential to Motorists
A Double Hit

Save Your Car —Save Money

RATES	
Lubrication Service	
Baby Cars	2-8-0
Medium "	3-0-0
Big "	3-8-0
Valve grinding	15-0-0
Fifth Consecutive service is done free.	

"Diamond" Specialised Lubrication Service

Car Repairing at Competetive Rates

Duco Painting

Day & Night Petrol Service

Let us serve you——
at our "one stop service Stores"

The Diamond Engineering Works

Phone South 400. 22 & 78, Mazra Road, CALCUTTA.

সূচীপত্র

ছান্দসিকী—	দিলীপকুমার রায়	৬৫
ভদ্রলোক (গল্প)—	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭১
দোহার—	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৮৫
আবহমান—	জীবনানন্দ দাশ	৮৬
সূর্য্যসাগর তীরে—	জীবনানন্দ দাশ	৮৬
প্রলাপী—	বিরাম মুখোপাধ্যায়	৮৭
বট্টি ও ধূম্রপটলে ইউরোপ—	যামিনীকান্ত সেন	৮৯
বিজ্ঞান, মানুষ ও সমাজ—	বিনয় ঘোষ	৯৮
ঝড়ের আকাশ (উপন্যাস)—	বিশ্বনাথ চৌধুরী	১০৫
সাহিত্য ও বাস্তব—	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	১১২
মৃত চোখ (গল্প)—	জ্যোতির্ময় রায়	১১৬
প্রেমরাজ্যে রসনার স্থান (গল্প)-	আশাপূর্ণা দেবী	১২১
সম্পাদকীয়		১২৮
পারাপার (গল্প)—	জগদীশ গুপ্ত	১৩০

শারদীয় উৎসবে

নূতন রেডিও সেট্‌স্

অপরিহার্য্য

বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

সোল ডিষ্ট্রীবিউটর্সঃ

রেডিও য়্যাণ্ড ফটো ষ্টোর্স

৪৪ বি, রবার্ট ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ (সাউথ)

ফোন—বি. বি. ৪৪৮২ কলিকাতা

এবার পূজায়

নিত্য নূতন ডিজাইনের একমাত্র পরিবেশক

কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্জ্জি-প্রতিষ্ঠান

মডার্ণ ষ্টোর্স

ভবানীপুর

৩৬নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড,

কলিকাতা

বিঃ দ্রঃ—আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন

ভারতে প্রস্তুত

মিটার ব্যাটারী

নিঃসংশয়ে নির্ভরযোগ্য ও সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দি

ইণ্ডিয়ান ব্যাটারী ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং

হেড অফিস—৫৮সি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

ফোন—পি, কে, ১৯৮৩

ওয়ার্কসপ—৯এ, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা। ফোন—বি, বি, ৩৭০০

HIMALAYA ELECTRIC CO.

Expert in

Rewinding A. C and D. C.

Electrical Machinery of any size and voltage.

Makers of

Switch-Boards, Control Gear, Transmission Line Equipment.

Undertakes

Electrical Installations of all Descriptions

Available Fans on Hire

Specialised in

Lifts of all designs—Erection Repairs and Maintainence

HIMALAYA ELECTRIC Co.

18, Ashutosh Mukherji Road, Calcutta.

সূচীপত্র

দৃষ্টি—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	১৩৭
এ-যুগের কবিতা—বুদ্ধদেব বসু	১৪০
গন্ধমূষিক (গল্প)—অমলেন্দু দাশগুপ্ত	১৪৬
আধুনিক যন্ত্র ও নক্ষত্রলোক—নিশাপতি ভট্টাচার্য্য	১৫৩
সহরতলী (উপন্যাস)—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬১
ট্যাক্সি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৬৮
কাণামাছি—সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৭১
বন্দীযন্ত্র—দিনেশ দাস	১৭২
নামঞ্জুর (গল্প)—আশালতা সিংহ	১৭৩
আধুনিকতা, গান্ধীত্ব ও গান্ধীবাদ—যামিনীকান্ত সেন	১৭৮
সীমান্তে (গল্প)—জ্যোতির্ম্ময় রায়	১৮৪
ঝড়ের আকাশ (উপন্যাস)—বিশ্বনাথ চৌধুরি	১৮৮
সম্পাদকীয়	১৯১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
১৮/এম, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আধুনিক রুচিসঙ্গত—

নূতন নূতন ডিজাইনের ব্যাঙ্ক-কাউণ্টার, অতি আধুনিক কৌচ, টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমিরা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক

ফ্যাসান ফার্নিসার্স

২৬৪ বি, বৌবাজার ষ্ট্রীট,

ফোন: বি, বি, ২৬৯৩ কলিকাতা

নিত্য নূতন ডিজাইনের একমাত্র পরিবেশক

কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্জ্জি-প্রতিষ্ঠান

মডার্ণ ষ্টোর্স

ভবানীপুর

৩৬নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড,

কলিকাতা

বিঃ দ্রঃ—আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন

ভারতে প্রস্তুত

মিটার ব্যাটারী

নিঃসংশয়ে নির্ভরযোগ্য ও সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দি

ইণ্ডিয়ান ব্যাটারী ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং

হেড অফিস—৫৮সি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

ফোন—পি, কে, ১১৮৩

ওয়ার্কসপ—৯এ, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা। ফোন—বি; বি, ৩৭০০

HIMALAYA ELECTRIC CO.

Expert in

Rewinding A, C. and D. C.

Electrical Machinery of any size and voltage.

Makers of

Switch-Boards, Control Gear, Transmission Line Equipment.

Undertakes

Electrical Installations of all Descriptions

Available Fans on hire

Specialised in

Lifts of all designs—Erection Repairs and Maintainance

HIMALAYA ELECTRIC Co.

18, Ashutosh Mukherji Road, Calcutta.

সূচীপত্র

আইনষ্টাইন ও আপেক্ষিকতাবাদ —সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯৫
মৃত্যু মহোৎসব (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২০১
বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবন —নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	২০৫
আধুনিক জার্ম্মান রূপচর্চ্চা—মিহিরকিরণ সেন	২১১
গায়ত্রী—হেমচন্দ্র বাগচী	২১৯
অপচয় (গল্প)—জ্যোতির্ম্ময় রায়	২২৩
সহরতলী (উপন্যাস)—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩০
আত্মহত্যার সেতু—সুধাংশুকুমার গুপ্ত	২৩৭
ঝড়ের আকাশ (উপন্যাস)—বিশ্বনাথ চৌধুরি	২৪০
সম্পাদকীয়	২৪৬

আধুনিক রুচিসঙ্গত—

নূতন নূতন ডিজাইনের ব্যাঙ্ক-কাউণ্টার, অতি আধুনিক কৌচ টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমিরা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক

ফ্যাসান ফার্নিসার্স

২৬৪ বি বৌবাজার ষ্ট্রিট,

ফোন :—বি, বি, ২৬২৩ কলিকাতা

নিত্য নূতন ডিজাইনের একমাত্র পরিবেশক

কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্জ্জি-প্রতিষ্ঠান

মডার্ণ ষ্টোর্স

ভবানীপুর

৩৬নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড,

কলিকাতা

বিঃ দ্রঃ—আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন

ভারতে প্রস্তুত

মিটার ব্যাটারী

নিঃসংশয়ে নির্ভরযোগ্য ও সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দি

ইণ্ডিয়ান ব্যাটারী ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং

হেড অফিস—৫৮সি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

ফোন—পি, কে, ১১৮৩

ওয়ার্কসপ—৯এ, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা। ফোন—বি, বি, ৩৭০০

বাগেরহাট কো-অপারেটিভ মিলস্

সুযোগ্য পরিচালনায়

গভর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে

বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য

আয়তন বৃদ্ধির বিরাট ব্যবস্থা হইতেছে।

শেয়ার ও এজেন্সি লউন

পরিচালক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

এডভোকেট, জমিদার ও ব্যাঙ্কার

চেয়ারম্যান খুলনা জিলাবোর্ড

কলিকাতা অফিস্ :

৭৭-১, হ্যারিসন রোড।

আচার্য্য ট্রান্স্‌পোর্ট লিঃ

আমরা বহুদিন যাবত মটর গাড়ীর 'বডি' তৈয়ার ও যাবতীয় মেরামতী কার্য্য অতি সুনামের সহিত করিয়া আসিতেছি।

এ অঞ্চলে ভাল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মটর গাড়ী আমাদের চেয়ে সস্তা দরে কেহ দিতে পারে না।

বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে মটরবাস ভাড়া দেওয়া হয়। অন্ততঃ—২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে না জানাইলে অনেক সময় চাহিদা মিটানো অসম্ভব হইয়া উঠে।

—আপনার পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

আচার্য্য ট্রান্সপোর্ট লিঃ

১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রবাসে বাঙ্‌লা সাহিত্য—প্রবোধচন্দ্র বাগচী	২৫১
পড়া—বুদ্ধদেব বসু	২৫৮
আলোকস্তম্ভ—জীবনানন্দ দাশ	২৬৩
অজ্ঞাতবাস—সমর সেন	২৬৪
চতুর্দশপদী—বিষ্ণু দে	২৬৫
শেষ বুঝ—অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী	২৬৫
কয়েকটি চৈনিক কবিতা—কানাই সামন্ত	২৬৬
সহরতলী (উপন্যাস)—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৮
আশা এবং আমি (গল্প)—জগদীশ গুপ্ত	২৭৫
সামাজিক বাস্তববাদের নূতন ভিত্তি—যামিনীকান্ত সেন	২৮৪
খেয়া বন্ধ (গল্প)—অমলেন্দু দাশগুপ্ত	২৮৯
ঝড়ের আকাশ (উপন্যাস)—বিশ্বনাথ চৌধুরি	[illegible]
সম্পাদকীয়	২৯৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র ১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আধুনিক রুচিসঙ্গত—

নূতন নূতন ডিজাইনের ব্যাঙ্ক-কাউণ্টার, অতি আধুনিক কৌচ, টেবল, চেয়ার, খাট, আলমিরা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক

ফ্যাসান ফার্নিসার্স

২৬৪ বি বৌবাজার ষ্ট্রিট,

ফোন :—বি, বি, ২৬৯৩ কলিকাতা

নিত্য নূতন ডিজাইনের একমাত্র পরিবেশক

কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্জ্জি-প্রতিষ্ঠান

মডার্ণ ষ্টোর্স

ভবানীপুর

৩৬নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড,

কলিকাতা

বিঃ দ্রঃ—আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

বাগেরহাট কো-অপারেটিভ মিলস্

সুযোগ্য পরিচালনায়
গভর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে
বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য

আয়তন বৃদ্ধির বিরাট ব্যবস্থা হইতেছে।

শেয়ার ও এজেন্সি লউন

পরিচালক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
এডভোকেট, জমিদার ও ব্যাঙ্কার
চেয়ারম্যান খুলনা জিলাবোর্ড
কলিকাতা অফিস্ :
৭৭-১, হ্যারিসন রোড।

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর ট্রেণিং স্কুল

ভবানীপুরের অতি পুরানো মটর ট্রেণিং স্কুল। হাতে-কলমে ড্রাইভিং এবং মটর মেকানিজম্ শিক্ষা দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন :

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর ট্রেণিং স্কুল
১৩৬ এ, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড,
ফোন : সাউথ ২০৬ কলিকাতা

সূচীপত্র

আইনষ্টাইন্ ও আপেক্ষিকতাবাদ—
সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৯৯
সহরতলী (উপন্যাস)—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১১
তিনি (গল্প)—গোপীনাথ রায় ৩১৭
কাঠ—দিনেশ দাস ৩২২
একটী কবিতা—হীরালাল দাশগুপ্ত ৩২৩
সাহিত্য ও গণ-সাহিত্য—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৩২৬
ক্ষণ-গোধূলি (গল্প)—আশাপূর্ণা দেবী ৩৩৩
ঝড়ের আকাশ (উপন্যাস) বিশ্বনাথ চৌধুরী ৩৪০
সম্পাদকীয়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শক্তিশালী কথাশিল্পী
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়ের
-দৈনন্দিন-
প্রকাশিত হইয়াছে।
মূল্য: দেড় টাকা।
প্রকাশক
ভারতী ভবন
কলেজ রো, কলিকাতা।

আধুনিক রুচিসঙ্গত
নূতন নূতন ডিজাইনের ব্যাঙ্ক-কাউণ্টার, অতি আধুনিক কৌচ টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমিরা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক

ফ্যাসান ফার্নিসার্স
২৩৪ বি, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
ফোন :—বি, বি, ২৬৯৩ কলিকাতা

সূচীপত্র

আধুনিকতা ও বৈরাগ্যবাদ— নিশাপতি ভট্টাচার্য্য	৩৪৭
ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা—সুধাংশু দাসগুপ্ত	৩৫২
ফাঁকি (গল্প)—জ্যোতির্ম্ময় রায়	৩৬৫
সহরতলী (উপন্যাস)—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬৮
বাসনা—জীবনানন্দ দাশ	৩৭৭
পরিস্থিতি—সমর সেন	৩৭৮
সংঘাত—অরুণকুমার মিত্র	৩৭৯
পৌনপুনিক—বিরাম মুখোপাধ্যায়	৩৮০
প্রান্তর (গল্প)—রজত সেন	৩৮২
ঝড়ের আকাশ (উপন্যাস)—বিশ্বনাথ চৌধুরী	৩৮৯
সম্পাদকীয়	৩৯৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

বাগেরহাট কো-অপারেটিভ মিলস্

সুযোগ্য পরিচালনায়
গভর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে
বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য
আয়তন বৃদ্ধির বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছে।

শেয়ার ও এজেন্সি লউন

পরিচালক—শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
এডভোকেট, জমিদার ও ব্যাঙ্কার
চেয়ারম্যান খুলনা জিলাবোর্ড

কলিকাতা অফিস্ঃ
৭৭-১, হ্যারিসন রোড।

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর ট্রেণিং স্কুল

ভবানীপুরের অতি পুরানো মটর ট্রেণিং স্কুল। হাতে-কলমে ড্রাইভিং এবং মটর মেকানিজম্ শিক্ষা দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন ঃ

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর ট্রেণিং স্কুল
১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড,
ফোন ঃ সাউথ ২০৬ কলিকাতা

আধুনিক রুচিসঙ্গত
নূতন নূতন ডিজাইনের ব্যাঙ্ক-কাউণ্টার, অতি আধুনিক কৌচ টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমিরা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক

ফ্যাসান ফার্নিসার্স
২৬৪ বি, বৌবাজার ষ্ট্রিট,
ফোন :—বি, বি, ২৬৯৩ কলিকাতা

শক্তিশালী কথাশিল্পী
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়ের
-দৈ ন ন্দি ন-
প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য: দেড় টাকা।

পরিচয় কার্য্যালয়
৮।বি দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা।

বাগেরহাট কো-অপারেটিভ
মিলস্

সুযোগ্য পরিচালনায়
গভর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে
বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য
আয়তন বৃদ্ধির বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছে

শেয়ার ও এজেন্সি লউন

পরিচালক—শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
এডভোকেট, জমিদার ও ব্যাঙ্কার
চেয়ারম্যান খুলনা জিলাবোর্ড

কলিকাতা অফিস্ :
৭৭-১, হ্যারিসন রোড।

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর
ট্রেণিং স্কুল

ভবানীপুরের অতি পুরানো মটর ট্রেণিং স্কুল। হাতে-কলমে ড্রাইভিং এবং মটর মেকানিজম্ শিক্ষা দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন :

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর
ট্রেণিং স্কুল

১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড,
ফোন : সাউথ ২০৬ কলিকাতা

সূচীপত্র

মহুয়ার দেশে—বুদ্ধদেব বসু	৩৯৫
চোখের নেশা (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪০২
সম্পাদকীয়	৪০৮
একটি কবিতা—সমর সেন	৪১১
মুক্তিকা—হীরালাল দাশগুপ্ত	৪১২
বাঘ—সুনীলরঞ্জন ঘোষ	৪১৩
শঙ্খ—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪১৪
সভ্যতা ও অবদমন—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৪১৫
সহরতলী (উপন্যাস)—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৯
কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় —হেমচন্দ্র বাগ্‌চী	৪২৮
ঝড়ের আকাশ (উপন্যাস)—বিশ্বনাথ চৌধুরী	৪৩২
বর আসবে ! (গল্প)—কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৪৩৭
চলচ্চিত্র	৪৪১

আধুনিক রুচিসঙ্গত
নূতন নূতন ডিজাইনের ব্যাঙ্ক-কাউণ্টার, অতি আধুনিক কোর্ট টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমিরা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক

ক্যাসানি ফার্নিশার্স
২৬৪বি, বৌবাজার ষ্ট্রিট,
ফোন :—বি, বি, ২৬৯৩ কলিকাতা

শক্তিশালী কথাশিল্পী
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়ের
-দৈনন্দিন-
প্রকাশিত হইয়াছে।
মূল্য : দেড় টাকা।
পরিচয় কার্য্যালয়
৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি

বাগেরহাট কো-অপারেটিভ মিলস্

সুযোগ্য পরিচালনায়
গভর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে
বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য
আয়তন বৃদ্ধির বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছে

শেয়ার ও এজেন্সি লউন

পরিচালক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
এডভোকেট, জমিদার ও ব্যাঙ্কার
চেয়ারম্যান খুলনা জিলাবোর্ড

কলিকাতা অফিস্ :
৭৭৭১, হ্যারিসন রোড।

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর ট্রেণিং স্কুল

ভবানীপুরের অতি পুরানো মটর ট্রেণিং স্কুল। হাতে-কলমে ড্রাইভিং এবং মটর মেকানিজম্ শিক্ষা দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন ঃ

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর ট্রেণিং স্কুল
১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড,
ফোন : সাউথ ২০৬ কলিকাতা

বঙ্কিমচন্দ্র ও সাম্যবাদ—হরিপ্রসন্ন মিশ্র ৪৪৭
ছাদ (গল্প)—বীরেশ্বর বিশ্বাস ৪৫০
দোজবরে—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৪৬১
বিরতি—নিখিল মৈত্র ৪৬৩
সহরতলী (উপন্যাস)—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৪
গল্প-সাহিত্য ও তার ঐতিহ্য
—কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ ৪৭১
মোমবাতি (গল্প)—গোপী রায় ৪৭৬
ঝড়ের আকাশ (উপন্যাস)—বিশ্বনাথ চৌধুরী ৪৭৯
সম্পাদকীয় ৪৮৩
চলচ্চিত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আধুনিক রুচিসঙ্গত

নূতন নূতন ডিজাইনের ব্যাঙ্ক-কাউণ্টার, অতি আধুনিক কৌচ টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমিরা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক

ফ্যাসান ফার্নিসার্স
২৬৪বি, বৌবাজার ষ্ট্রিট,
ফোন :—বি, বি, ২৬৯৩ কলিকাতা

শক্তিশালী কথাশিল্পী
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়ের
দৈনন্দিন
প্রকাশিত হইয়াছে।
মূল্য ঃ দেড় টাকা।
পরিচয় কার্য্যালয়.
৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা।

পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা

- শা র দী য় স ং খ্যা -

রূপে আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

●

প্রমথ চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হুমায়ুন কবীর, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, আশাপূর্ণা দেবী, সমর সেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, হীরালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এ-সংখ্যায় লিখবেন।

এ ছাড়া

চিত্র-সম্পদে, অঙ্গ-সৌষ্ঠবে ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে 'পত্রিকা'র এই বিশেষ সংখ্যাখানি অতুলনীয় হবে।

মূল্য ঃ চার আনা মাত্র

●

'শারদীয়-সংখ্যা পত্রিকা'

নিঃসংশয়েই পণ্য-প্রচারের শ্রেষ্ঠ বাহন।

পত্রিকা

সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ	সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৪৭	প্রথম সংখ্যা

	পৃষ্ঠা
মধ্যযুগের সাধনার একটি ধারা—প্রবোধচন্দ্র বাগচী	১
সঞ্চয় (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭
কলঙ্কিনী (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৭
ত্রিসীমানার গান—জীবনানন্দ দাশ	২৬
শাদা—নিশিকান্ত	২৭
তবু লজ্জা পায়না দেবতা—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২৮
দুঃস্বপ্ন—সমর সেন	২৯
আওয়াজ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩০
যাত্রা—হীরালাল দাশগুপ্ত	৩১
রোদ (গল্প)—বুদ্ধদেব বসু	৩৩
সহরতলী (উপন্যাস)—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯
বিশ্ব সাহিত্য ও নোবেল প্রাইজ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৪৩
ধর্ম্মঘট (গল্প)—বিমল মিত্র	৪৯
বাধা—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৮
মাটির পৃথিবী (গল্প)—আশাপূর্ণা দেবী	৬১
চোখ (গল্প)—বিশ্বনাথ চৌধুরী	৬৭
চিত্র-শিল্পের একটা দিক—সুধীরেন্দ্র সান্যাল	৭৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

FOR YOUR PUJA MARKETING——

MODERN STORES

Tailors of Taste

SMART TAILORING SERVICE

Punctual Delivery

36, Ashutosh Mukherji Road, Bhowanipur,

CALCUTTA.

সব চেয়ে সস্তা পানীয় কি

নিশ্চয়ই চা—অবশ্য জল বাদ দিলে। এত সস্তা যে সব চেয়ে গরীব লোকও ইচ্ছে করলে রোজ কয়েকবার চা খেতে পারে। এক পয়সা দিয়ে এক পুরিয়া চা কিনলে তা' থেকে পাঁচ পেয়ালা উৎকৃষ্ট চা পাবেন। মনে রাখবেন সবচেয়ে ভালো চা-ই শেষ পর্যন্ত সস্তা পড়ে।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশি দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

এক পয়সার চায়ে পাঁচ পেয়ালা হয়

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যানসান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 124

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পত্রিকা

সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ | সূচীপত্র—কার্তিক, ১৩৪৭ | দ্বিতীয় সংখ্যা

	পৃষ্ঠা
জড়-বিশ্বে মানুষের স্থান—সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮১
গৃহিণী (গল্প)—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬
জীবিকাবৃত্তি—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	৯৩
দাবি (গল্প)—পূর্ণেন্দু গুহ	৯৭
মহাজন—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১০৬
রূপান্তর—হীরালাল দাশগুপ্ত	১০৮
সাঙ্গ—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	১০৮
ঘর—সৌরীন্দ্র মিত্র	১০৯
ভিজিট (গল্প)—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	১১০
ঝড়ের আকাশ (উপন্যাস)—বিশ্বনাথ চৌধুরী	১১৬
চলচ্চিত্র—জে. বি.	১২১

MODERN STORES

Tailors of Taste

SMART TAILORING SERVICE

Punctual Delivery

36, Ashutosh Mukherji Road, Bhowanipur,
CALCUTTA.

সিল্‌ভার জুবিলী টী কোং

১।১ ডি, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা।

সুগন্ধী ও তৃপ্তিকর চা যদি যথার্থ-ই পাইতে চান
তবে আপনাদের চিরপরিচিত

সিল্‌ভার জুবিলী টী কোং-তেই

অনুসন্ধান করুন।

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান—বাঙ্গালীর সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

আধুনিক রুচিসঙ্গত

নূতন নূতন ডিজাইনের ব্যাঙ্ক-কাউন্টার, অতি আধুনিক কৌচ, টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমিরা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক

ফ্যাসান ফার্ণিসার্স

২৬৪বি, বৌবাজার ষ্ট্রিট,
ফোন:—বি, বি, ২৬৯৩ কলিকাতা

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর ট্রেণিং স্কুল

ভবানীপুরের অতি পুরানো মটর ট্রেনিং স্কুল। হাতে-কলমে ড্রাইভিং এবং মটর মেকানিজম্ শিক্ষা দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

আচার্য্য ব্রাদার্স মটর ট্রেণিং স্কুল

১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড,
ফোন: সাউথ ২০৬ কলিকাতা

কলিকাতা লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পত্রিকা

সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ | সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ ও পৌষ '৪৭ | ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

	পৃষ্ঠা
চাহার দরবেশ—প্রমথ চৌধুরী	১২৫
আর্ট ও আধুনিক সাহিত্য—অন্নদাশঙ্কর রায়	১৩৬
বানপ্রস্থ—অমলেন্দু দাশগুপ্ত	১৪৩
আগাগোড়া—জীবনানন্দ দাশ	১৫১
প্যারাডাইস লষ্ট—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১৫৩
তুলে নাও বল্লম তোমার—রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৫
নিরুপমার চোখ—প্রতিভা বসু	১৫৭
জীবিকাবৃত্তি—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	১৬৩
মুখবন্ধ—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৭০
সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ নৈতিক ভিত্তি—বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৮
চলচ্চিত্র	১৮১

MODERN STORES

Tailors of Taste

SMART TAILORING SERVICE

Punctual Delivery

36, Ashutosh Mukherji Road, Bhowanipur,
CALCUTTA.

সিল্‌ভার জুবিলী টী কোং

১১১ডি, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড

ভবানীপুর, কলিকাতা।

সুগন্ধি ও তৃপ্তিকর চা যদি যথার্থ-ই পাইতে চান

তবে আপনাদের চিরপরিচিত

সিল্‌ভার জুবিলী টী কোং-তেই

অনুসন্ধান করুন।

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান—বাঙ্গালীর সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

পত্রিকা

—সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র—

নিয়মাবলী—'পত্রিকা' প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ভাদ্র থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত বছর গোনা হয়। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত তিন টাকা। ভিঃ পি-তে তিন টাকা চার আনা। প্রতি সংখ্যার দাম চার আনা। নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

'পত্রিকা'র প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদির সংগে সর্বদাই উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়। নতুবা প্রাপ্ত রচনার ফলাফল সম্বন্ধে জানানো বা অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো অসম্ভব। রচনা, বিনিময়-পত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নামে পি ৩২৫ বি, কবীর রোড, বালীগঞ্জ—ঠিকানায় প্রেরিতব্য। আর, টাকা-কড়ি, বিজ্ঞাপন ও এজেন্সী সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠিপত্র কর্মসচিবের নামে 'পত্রিকা' কার্যালয়ে পাঠাতে হয়। বিজ্ঞাপনের দর: সাধারণ সংখ্যায় এক মাসের জন্য সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ২০৲, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲, সিকি পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা। বিশেষ পৃষ্ঠার হার ও বার্ষিক চুক্তির জন্য কর্মসচিবের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে হয়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পত্রিকা

সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ — সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৪৭ — পঞ্চম সংখ্যা

	পৃষ্ঠা
বৃহত্তর বঙ্গের সীমান্ত সমস্যা—কালিদাস নাগ	১৮৩
বিচিত্র—আশাপূর্ণা দেবী	১৮৯
মতান্তর ও মনান্তর—বুদ্ধদেব বসু	১৯৭
বিধাতার বিধানে—কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	২০৪
হাইফা—অমিয় চক্রবর্ত্তী	২০৯
নব যৌবনের গান—হীরালাল দাশগুপ্ত	২১০
বসন্ত বিলাপ—প্রমথনাথ বিশী	২১১
ঝড়ের আকাশ—বিশ্বনাথ চৌধুরী	২১৩
চলচ্চিত্র	২২১

গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

MODERN STORES

Tailors of Taste

SMART TAILORING SERVICE

Punctual Delivery

36, Ashutosh Mukherji Road, Bhowanipur,
CALCUTTA.

আধুনিকতম যন্ত্রপাতি —
প্রসারক্ষম যন্ত্রাগার —
বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র —
বস্ত্রশিল্পে বাংলার
জাগৃতির নবতম
অবদান

সুভাষচন্দ্র কটন মিলস্ লিঃ

অফিস
১০২বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মিলস্—সূর্য্যনগর, ই, বি, রেলওয়ে

পত্রিকা

—সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র—

নিয়মাবলী—'পত্রিকা' প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ভাদ্র থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত বছর গোনা হয়। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত তিন টাকা। ভিঃ পি-তে তিন টাকা চার আনা। প্রতি সংখ্যার দাম চার আনা। নমুনার জন্য চার আনার ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

'পত্রিকা'য় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদির সংগে সর্বদাই উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়। নতুবা প্রাপ্ত রচনার ফলাফল সম্বন্ধে জানানো বা অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো অসম্ভব। রচনা, বিনিময়-পত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নামে পি ৩২৫ বি, কবীর রোড, বালীগঞ্জ—ঠিকানায় প্রেরিতব্য। আর, টাকা-কড়ি, বিজ্ঞাপন ও এজেন্সী সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠিপত্র কর্মসচিবের নামে 'পত্রিকা' কার্যালয়ে পাঠাতে হয়। বিজ্ঞাপনের দর: সাধারণ সংখ্যায় এক মাসের জন্য সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ২০৲, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲, সিকি পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা। বিশেষ পৃষ্ঠার হার ও বার্ষিক চুক্তির জন্য কর্মসচিবের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে হয়।

কার্যালয়: **৩৯, রাণী রাসমণি রোড,** ফোন কলি: **৬৩২৭**
পোঃ ধর্মতলা, কলিকাতা।

রবীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কর্মসচিব

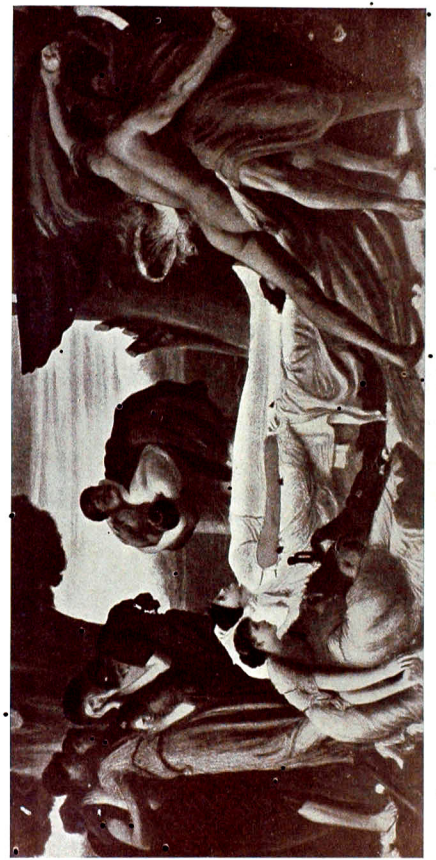

মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধরত হারকিউলিস
শিল্পী—লর্ড লীটন

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

প্রথম বর্ষ, পত্রিকা ভাদ্র,
প্রথম সংখ্যা সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র ১৩৪৬

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

পুরোনো লেখক

প্রমথ চৌধুরী

সদ্য-প্রকাশিত বা প্রকাশোন্মুখ পত্রিকায় লেখা ইতিপূর্ব্বেও লিখেছি। সে-সব লেখা যে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে, তা' নয়। এ জাতীয় অনেক খণ্ড-প্রবন্ধ মাঠে মারা গিয়েছে। তার জন্য আমি অবশ্য দুঃখিত নই। আমার মুখের বাণী প্রচার না হ'লে যে ভারত উদ্ধার হবে না, এ অহমিকা আমার নেই।

তবে যে আমি নতুন সম্পাদকরা লিখতে অনুরোধ করলেই কলম ধরি তার কারণ, আমি একজন পুরোনো লেখক। এই অনুরোধই প্রমাণ যে সেকালের লেখার জের চলছে। মানে পুরোনো লেখকরা একদম বাতিল হ'য়ে যান নি, কস্মিনকালে যাবেনও না। এর কারণ,—অতীত ও বর্ত্তমানের ভিতর কোনো পূর্ণচ্ছেদ নেই। ইংরাজিতে যাকে বলে full stop, সে শুধু দমের কথা। কথা কইতে কইতেও হাঁফ জিরতে হয়। আর কোথায় কতক্ষণ জিরতে হবে—"কমা" প্রভৃতি তারই চিহ্নমাত্র। অবশ্য বক্তৃতায় punctuation নেই। কিন্তু লেখকদের কথার স্রোত D. C. current নয়।

সে যাই হোক্, বর্ত্তমান বলে' কোন কাল নেই; ছিল অতীত, আর থাকবে ভবিষ্যৎ। অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণের নাম বর্ত্তমান, আর সে ক্ষণ মাত্র। সুতরাং মানুষ যাকে সাহিত্য বলে তা' বর্ত্তমানকে অতিক্রম করতে বাধ্য।

আমি একজন সেকেলে লেখক, অর্থাৎ বহুকেলে লেখক। কলমের কৃপায় আমি দু'টি বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছি। আমি নাকি চলতি ভাষাকে লিখিত ভাষায় প্রমোশান দিয়েছি।

আমি যে মুখের কথার সঙ্গে লেখার কথার যোগ-সাধন করতে চেষ্টা করেছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তা'তে কৃতকার্য্য হয়েছি কিনা তা' বলতে পারি নে। বইয়ের ভাষা কোন দেশেই মৌখিক ভাষা নয়, তাই বলে' মৌখিক ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমি বাংলা সাহিত্যে এই দুই ভাষার মিল ও গরমিল রক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছি। অনেকে আমার প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করেছেন, অনেকে করেন নি। আর আজকাল সাহিত্যের যা মুখ্য বাহন—সংবাদ পত্র—তা' ত সাধু ভাষাকে আঁকড়ে ধরে' রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ—আমি critic বলে' গণ্য। এদেশে তাঁরই নাম critic, যিনি নিন্দা প্রশংসায় মুখর। সুতরাং আমি যদি আধুনিক সাহিত্যের বিচার করতে বসে' কারও প্রশংসা করি তাহ'লে তিনি বলবেন, প্রমথ

চৌধুরী critic বটে, আর যদি তা না করতে পারি তাহ'লে লেখকরা বলবেন, প্রমথ চৌধুরী আধুনিক নন্—অর্থাৎ জরাজীর্ণ সেকেলে লেখক। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে আমি আটকে পড়েছি। সেকেলে লেখকরা যে একেলে পাঠক হ'তে পারেন না—সে কথা সত্য। অলমিতি বিস্তারেণ।

পুনশ্চ :—আমি সেই দলের পুরোনো লেখক যাঁরা লিখতেন কিন্তু সে-লেখা ছাপাবার হিসেব জানতেন না। কত ধানে যে কত চাল হয় তার খবর যেমন আমি জানিনে—তেমনি কত হস্তাক্ষরে যে কত ছাপার অক্ষর হয় সে-হিসেবও আমি জানিনে। তার হিসেব জানেন প্রিণ্টাররা। এবং তাঁদের মুখাপেক্ষী হয়েই আমরা লেখার কাজ চালিয়েছি। ছাপাখানার রহস্য জানা ছিল শুধু দৈনিক সংবাদপত্রের লেখকদের। তা' যে তাঁদের ছিল তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছি।

১৯০৬ অথবা সাত খৃষ্টাব্দে আমি একদিন দিবা-দ্বিপ্রহরে Bengalee আফিসে বসে'ছিলুম সুরেন্দ্রবাবুর খাস্-কামরায়। গুরুজীর সঙ্গে ভারত উদ্ধার সম্বন্ধে জোর আলোচনা করছি এমন সময়ে Reuter-এর একখানি টেলিগ্রাম এল। সুরেনবাবু সে'টি পড়ে' চাপরাসিকে বললেন, ডাক অমুক বাবুকে। অম্‌নি অনেক সব-এডিটার বাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। সুরেন্দ্রবাবু তাঁকে উক্ত টেলিগ্রাম পড়তে আদেশ করলেন। সব-এডিটারবাবু তার উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন—তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি কর্ত্তব্য। এডিটার সুরেনবাবু আদেশ করলেন, যাও, এ বিষয়ে একটি আর্টিকেল লিখে নিয়ে এসো।

—এর স্বপক্ষে না বিপক্ষে?

—অবশ্য বিপক্ষে।

—এক ক'লাম না আধ ক'লাম?

—এক ক'লামও নয়, আধ ক'লামও নয়, তিনপোয়া ক'লাম।

জো হুকুম বলে' তিনি অন্তর্ধান হ'লেন।

তিনপোয়া ঘণ্টা না যেতেই তিনি একটি লেখা নিয়ে ফিরে এলেন। সুরেন্দ্রবাবু সে'টি আমাকে পড়তে দিলেন। পড়ে' দেখি লেখাটি খাসা হয়েছে।

এ বিদ্যে আমি অর্জ্জন করিনি। সুতরাং আমার লেখা যে মাপে খাটো হবে তা' আর আশ্চর্য্য কি।

গদ্য-কবিতা

প্রবোধকুমার সান্যাল

কানের দুল দুটো দুলে ওঠে কথা বলতে গিয়ে; অর্দ্ধসমাপ্ত আবদার রস গদগদ ভঙ্গীতে মুখের মধ্যেই মিলিয়ে যায়।

লীলা প্রথমে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরলে,—আদরিনীরা যেমন পুরুষের স্নেহপ্রবণতার সুযোগে গ্রীবা দুলিয়ে অভিমান জানায়।

বললে, বেশ করেছি, খুব করেছি—

প্রণয়-প্রশ্রয়িনীদের অস্ত্র কণ্ঠে আর চোখের কোণে। তার রসঢালা অধরের দিকে চেয়ে হরিচরণ বললে, গয়না বাঁধা দিয়ে সিনেমা দেখা? কী সর্ব্বনাশ।

আবার দেখবো ফের দেখবো।—এই ব'লে সভয়ে লীলা স্বামীর গলা ছেড়ে উঠে গেল এবং পিছন দিক থেকে তার পিঠের উপরে মুখ লুকিয়ে বললে, একি আমার দোষ? তুমি নিয়ে যাওনা কেন? কেন তুমি বাড়ী থাকো না?

হরিচরণ বললে, আচ্ছা বেশ, রোজ যেয়ো।

তার গলার আওয়াজটাই যথেষ্ট। পলকের মধ্যেই লীলার উত্তেজনা কেঁদে আসে। সে ঘুরে এসে স্বামীর হাত দু'খানা টেনে নিয়ে নিজের গলায় জড়ায়। বলে, তুমি বলোনি কেন যে, গয়না বাঁধা দিয়ে সিনেমায় যাওয়া অন্যায়?

এবং তারপরে, বলা বাহুল্য, স্বামীস্ত্রীর বিবাদ ওইখানেই মিটমাট হয়ে যায়। মিটমাট না ক'রেই বা উপায় কি। আজ তিন বছর হোলো তাদের বিয়ে হয়েছে। লীলার বয়স পনেরো থেকে আঠারোয় এসে দাঁড়ালো, কিন্তু জ্ঞানমার্গে তার উন্নতি সুদূরপরাহত। সে ভালো ক'রে কাপড় পড়তে শেখেনি, সাজতে জানে না, না জানে স্বামীর সুখদুঃখের সঙ্গী হ'তে। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ।

বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে মোতায়েন থাকা হরিচরণের পক্ষে সম্ভব নয়। তার অনেক কাজ। যন্ত্রপাতির কাজ কারবারে তার খাটুনি আজকাল অনেক বেড়ে গেছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা,—তার কাজের কামাই নেই, অবকাশ বড় কম।

সে বললে, আজ আমি কোথায় কোথায় গিয়েছি, কি কি করেছি শুনবে?

না আমি শুনবো না, কিছুতেই শুনবো না—এই ব'লে লীলা রাগ ক'রে বিছানায় গিয়ে উঠলো। স্বামী যাতে আর কিছুতেই তার মুখ দেখতে না পায় এজন্যে মুখের উপর মুড়ি দিয়ে সে শক্ত হয়ে শুয়ে রইল। আর একটুও বাক্যালাপ সে করবে না।

হরিচরণের রাগ হয় না। রাগ করবার যোগ্য স্ত্রী তার নয়। এই অর্ব্বাচীন নির্ব্বোধ মেয়েটিকে সে দীর্ঘ তিন বছর চালিয়ে নিয়ে এলো। তার স্নেহের প্রশ্রয়ের মধ্যে ওর কত চপলতা, কত কী অবাধ্যতা, তার সীমা নেই। স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সে একটু হাসলো, আর কিছু বললে না।

আলোটার কাছে গিয়ে হরিচরণ তার জামার পকেট থেকে এক তাড়া কাগজপত্র বার করলে। আজ তার জমাখরচের হিসেব অনেক বেশি। এক টন্ সুরকির দাম ছ'টাকা সাড়ে শনেরো আনা। তিনশো একান্ন মণ সুরকির দাম আজ রাত্রে তাকে ক'ষে বার করতেই হবে। কাল সকালে মুখার্জি কোম্পানীতে জয়েন্টের টাকা হিসেব ক'রে জমা দেওয়া চাই। ওদিকে সেই জয়রামপুর ফার্ম্ থেকে ড্রাফ্ট্স্ম্যান্ সেই জল পাম্প্ করার যন্ত্রটার ড্রয়িং পাঠিয়েছে, সেটা নিয়ে কাল বাজারে ঘোরা চাই,—বাস্তবিক, তার একটুও নিশ্বাস নেবার সময় নেই।

একবার মুখ ফিরিয়ে সে ডাকলে, লীলা? শুন্ছ?

লীলা সাড়া দিল না।

হরিচরণ মিনতি ক'রে বললে, দীনু মিস্ত্রির হিসেবের কাগজগুলো সেই যে রাখতে দিয়েছিলুম তোমার কাছে,—লক্ষীটি, দাওনা, তার হিসেবটা আজ চুকিয়ে ফেলতেই হবে। ভারি তাগাদা দিচ্ছে। ও লীলা?

লীলা সাড়া দিল না, অতএব নিরুপায় হয়ে হরিচরণকে তিনশো একান্ন মণ সুরকির মরুভূমিতে হাতড়ে চলতে হোলো।

নিচে থেকে পিসিমা এক সময়ে খাবার জন্য ডাক দিলেন। ঠাকুর খাবার বেড়ে দিয়েছে। হরিচরণ কাগজপত্র ছড়িয়ে রেখে উঠে নিচে চ'লে যায়। হিসেবগুলো তার মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেতে থাকে।

আহারাদি সেরে উপরে উঠে এসে সে দেখলে, লীলা অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। স্বামীর পক্ষে প্রশ্ন করা উচিৎ, স্ত্রীর আহার হয়েছে কিনা। হরিচরণের সে কর্ত্তব্য মনেই এলো না। রাত অনেক হয়েছে বৈ কি, বারোটা বাজে। চোখে তার ঘুমের আবেশ জড়িয়ে এসেছে। এখন আবার হিসেবপত্র নিয়ে বসলে বাকি রাতটুকু পুইয়ে যাবে। কাল সকালে উঠেই তার নতুন বাড়ীর কাজের তদারকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। খাটুনি অনেক। কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে ঘন হয়ে।

দরজাটা বন্ধ ক'রে আলোটা নিবিয়ে হরিচরণ বিছানায় এসে উঠলো। লীলা ঘুমিয়েছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে, তারই একান্তে অল্প একটুখানি জায়গা নিয়ে সেই নরম আর মধুর বিছানায় হরিচরণ কুণ্ঠিতভাবে শুয়ে পড়ে।

লীলা? ওগো—

লীলার সাড়া নেই। পরিশ্রম একটু হয়েছে বৈ কি। সিনেমার যাওয়া আসা, সংসারের কাজে সারাদিন ছুটোছুটি,—স্ত্রীকে সে আর ডাকলে না। জান্লার বাইরে অন্ধ শ্রাবণের বর্ষণ মুখরতা অনেকক্ষণ থেকেই চলছে, পথের কোন্ প্রান্ত থেকে একটুখানি জলে-ভেজা পাথুর আলো এসে পড়েছে খাটের বাজুর উপর। শ্রাবণের একটা তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা বাইরে যেন বায়ুর বেগে নিশ্বাস ফেলে চলেছে। হরিচরণ স্থির হয়ে শুয়ে রইল। কিন্তু আলো জ্বালা থাকলে দেখা যেতো তার পাশে যে-মেয়েটি আপাদমস্তক আবৃত ক'রে নিঃশব্দে প'ড়ে রয়েছে তার আল্তা-পরা পা দুখানি একটি অপরটির গা ঘষ্‌ছে,—ঋতু-সমাগমে হরিণ যেমন হরিণীর গা চেটে লেহন করে। কাছে টেনে নেবার প্রতীক্ষায় নারী জেগে ছিল।

দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে? উই যে আমাদের নতুন বাড়ী। চিড়িতনের কোকর—মিঠে গোলাপী রং মানিয়েছে দেওয়ালে,—ও কি, কি ভাবছো?—হরিচরণ উৎসুক হয়ে স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরালে।

চলন্ত মোটরে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে লীলা বললে, কিচ্ছু না।

হরিচরণ চোখের তারায় উল্লাসের ঝল্কার তুলে বললে, এমন স্নানের বাড়ী কল্‌কাতায় একটিও নেই, রবি ঠাকুরের শ্যামলীকেও হার মানায়। জান্লা দেখবে কচি কলাপাতা রং, ইঁট, চুণ, সুরকির একটা অদ্ভুত স্বপ্ন, বর্ণপরিচয়ের অক্ষরগুলো একত্র ক'রে যেন একটা গীতিকবিতা।

আঃ—লীলা চোখ রাঙিয়ে উঠলো।—এক কথা একশো বার। যাবো না আমি তোমার সঙ্গে।

হরিচরণ যেন ফুৎকারে নিভে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখলে তাদের ট্যাক্সি নতুন বাড়ীর ধারে থেমেছে।

দু'জনে নামতেই লোকজন ঘিরে এসে দাঁড়ালো। কেউ দালাল, কেউ মিস্ত্রী, কেউ সিমেণ্টওয়ালা। হরিচরণ বললে, বাড়ী ত প্রায় শেষ, আনলুম আমার স্ত্রীকে দেখাতে—বুঝলেন না, মেয়েদের চোখই আলাদা। পুরুষ মানুষ আর বাড়ীতে থাকে কতটুকু, বাড়ী ত মেয়েদেরই জন্যে। কাল আবার পিসিমাকে এনে দেখাবো। এসো, এই দিক দিয়ে—ইয়া, আরে, এ কি করেছেন সরকার মশাই, দালানের সিলেন খুলিয়েছেন? জ'মে গেছে বুঝি? কাল রাতে যে বিষ্টি, ঘুমের ঘোরে ভাবলুম বুঝি চুণের ঘরে জল ঢুক্‌ছে!

মেঘের মতো মুখ ক'রে লীলা প্রায়-সমাপ্ত বাড়ীটায় ঘুরে ঘুরে স্বামীর সঙ্গে দেখতে লাগলো। বাঁশ, কাঠ, চুণ-সুরকি, ইঁটের কুচি, দড়ি, করোগেটের টুকরো,—চারিদিক একাকার, রং আর ছুতোরের কাজ চলছে। নতুন কাঁচা রঙের গন্ধে ঘরগুলো ভরো ভরো। খুশিতে হরিচরণের মুখখানা আরক্ত আভায় অলঙ্কৃত। এখানে একটা নতুন জীবন জটলার পত্তন হবে। এখানকার কুমারী-মৃত্তিকায় পছন্দসই ফুলের বীজ বপন করা হবে। আগামী বসন্তে পুষ্পবীথিকা। হরিচরণের হৃদ্‌পিণ্ডটা রক্তের তরঙ্গে নাচতে লাগলো।

এদিকে এসো, লীলা, এ বারান্দায় দাঁড়ালে সমস্ত শহর, দূ—রে চেয়ে দেখো মনুমেণ্টের চূড়ো—সে ব'লে চললো, দক্ষিণ দিকে নতুন আকাশের টুক্‌রো। বাথরুম্ দেখবে এসো।

লীলা তার পিছনে পিছনে চললো মুখে রাশি পরিমাণ বিরক্তি নিয়ে।

ওহে মিস্ত্রি, ইটালিয়ান্ টাইল্স্ আসেনি বুঝি? বাথ্ টাব্‌টা কাঁচের হবে মনে আছে ত? এইখানে ধারাযন্ত্র দেবো। অদ্ভুত গন্ধ ঘরটায়—না? এইটে সাবান তেল রাখার কুলুঙ্গী। জানলার ফ্রেমে হবে রঙীন কাঁচ, প্রায় কাঁচেরই ঘর। বাথ্‌রুমে গান গাইতে বেশ লাগে, জলের শব্দে মিলে যায়।—হরিচরণ বললে, পছন্দ হয়েছে ত? হবেই জানা কথা।

লীলা বললে, ফিরে চলো এবার।

সে কি, আরো কত যে দেখবার আছে। দাঁড়াও, অনেক কাজ,—ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। হিসেবটা সেরে দিই—ওহে সরকার মশাই—

না, ফিরে চলো, আর আমি একটুও থাকবো না—লীলার ঝোঁকটা বেড়েই চললো, একটুও ভালো লাগছে না, এক্ষুনি চলো।

বিস্মিত হয়ে হরিচরণ বললে, কী বলছ তুমি?

থাকতে আমি পাচ্ছিনে। লীলা চেঁচিয়ে উঠলো—থাকো তুমি, আমি চ'লে যাই।

একা যাবে কোথায় ট্যাক্‌সিতে? ছি, কী হ'লে তুমি?—হরিচরণ তার হাত চেপে ধরলো। লীলা মুখ তুলতেই দেখা গেল বড় বড় জলের ফোঁটা তার দুই চোখে ভ'রে উঠেছে।

নূতন সিঁড়ির ধারে সরকার মশায়ের পায়ের শব্দ হতেই হরিচরণ স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিলে। বললে, সরকার মশাই, আসছি আমি এখুনি এঁকে বাড়ী পৌছে দিয়ে—শরীর ত এঁর ভালো নয়। এসো।

স্বামীর পিছনে পিছনে নেমে এসে লীলা গাড়ীতে উঠলো। হরিচরণকে আবার এখুনি ফিরে আসতে হবে। জলের পাইপ কোথা দিয়ে আসবে দেখা দরকার। পাঁচিল মাপের কাজে তাকে না হলেই চলবে না। বাড়ীর নর্দ্দমাগুলোর পথ সে এসে বুঝিয়ে দেবে। সে না থাকলে সিমেণ্টের হিসেব হবে না; ছুতোররা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে—সে এসে কাজের হিসেব নেবে। চলন্ত মোটরে স্থির হয়ে ব'সে হরিচরণ কাজের কথাই ভাবতে লাগলো।

লীলা একটু কাছে স'রে এলো। তার হাতের উপর হেলান দিয়ে মুখ তুলে বললে, আর তোমাকে আমি এখানে আসতে দেবো না।

মুখ ফিরিয়ে হরিচরণ বললে, কোথায়? নতুন বাড়ীতে!

হ্যাঁ। তুমি আসতে পাবে না।—এই ব'লে লীলা তার উৎসুক চিক্কন অধর তুলে ধরলে।

আমি না এলে কাজকর্ম্ম দেখবে কে?—হরিচরণ বললে, সিঁড়ির রেলিংগুলো তোমার কেমন লাগলো? বেশ নতুন ধরণের হয়েছে, নয়, জানো ছ' টাকা তেরো আনা ক'রে ওদের হন্দর। আজকাল ভারি আক্রা।

ব্যর্থ মুখ লীলা ফিরিয়ে নিলে। মোটর প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছে। সোজা হয়ে ব'সে সে বললে, আজ তবে আমাকে নিয়ে চলো সেখানে?

কোথায়?

সেই যে খড়দার গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিলে?

বারে, বেশ মেয়ে ত' তুমি?—হরিচরণ বললে, এটি বুঝি বেড়ানো হলো না? তুমিও বেড়ালে, আমারও কাজ হোলো—এই ত' বেশ!

মুখখানা অন্ধকার ক'রে লীলা চুপ ক'রে রইলো।

সেদিন ফিরে এসে সমস্ত দিন হরিচরণ তার নিত্যকর্ম্মের জটিল জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল। তার সমস্ত চিন্তা আর কল্পনার ধারা তার এই নতুন সৃষ্টির সঙ্গমে এসে মিলেছে। আর কোনদিকে তার মনের গতি ঘুরিয়ে দেবার অবসর নেই, এ যেন একটা ভয়ানক নেশা।

বাড়ী ফিরতে তার একটু বেশি রাত্রি হোলো বৈ কি, এত দেরি তার সহসা হয় না। স্নান ক'রে কাপড় চোপড় ছেড়ে সে এসে খেতে বসলো। পিসিমা খাবার রেখে বসেছিলেন। আশপাশে লীলাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না—সকালের সেই অজস্র অভিমান সে বোধকরি ভুলতে পারেনি। কিন্তু অভিমান ভাঙাবার সময় হরিচরণের নেই, সে মুখ বুজে খেতে লাগলো।

পিসিমা রুষ্ট মুখে হরিচরণকে বাতাস করতে করতে এক সময় বললেন, এত অবাধ্য হ'লে ত' সংসার চলে না, হরিচরণ।

কি হোলো, পিসিমা?

বৌমার কথা বলছি। সারাদিন খেটেখুটে তুই বাড়ী এলি, আর সে নিজের মতে চ'লে গেল।

কোথায় সে?

সে বাড়ীতে নেই বাছা।

সে বাড়ীতে নেই! মানে?—হরিচরণ মুখ তুললে।

পিসিমা বললেন, সেই যে তুই রেখে গেলি, তার ঘণ্টাখানেক পরেই সে একলা চ'লে গেল, খেলে না নাইলে না। জিজ্ঞেসা করলুম, বৌমা, কোথায় যাচ্ছো গো? ব'লে গেল, দিদির বাড়ী? জানিনে বাছা এখনকার মেয়েদের কাণ্ড।

আহারাদি ক'রে হরিচরণ উপরে উঠে এলো। ঘরের মধ্যে একরাশ জামা কাপড় ছড়ানো। বোঝা গেল, সব চেয়ে যে শাড়ী আর জামা তার পছন্দ সেইগুলি প'রে সে গেছে। অন্যান্য জামা, কাপড়, আণ্ডারওয়ার, ব্লাউস—সমস্তগুলি ঘরময় বিক্ষিপ্ত, ধূলিধূসরিত। সমস্ত ঘরটা সুগন্ধী দ্রব্য আর পাউডারের স্তিমিত গন্ধে ভরোভরো। হরিচরণ সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও সেগুলি একে একে পাট ক'রে সুবিন্যস্ত অবস্থায় আলমারির মধ্যে সাজিয়ে রাখলো। তার ভয়ানক রাগ হোলো, কারণ এগুলি প্রয়োজনমতো খুঁজে না পেলে সেই অবুঝ আর অনভিজ্ঞ মেয়েটি তার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে।

কিন্তু রাত্রি দশটা বাজে। স্বামীকে ছেড়ে কোথাও থাকবার মেয়ে সে নয়। সিনেমায় আজ সে যায়নি। হরিচরণের বলিষ্ঠ হাতখানার উপর মাথা রেখে না শুলে সেই মেয়ের ঘুম হয় না। দিদির বাড়ী সে কিছুতেই থাকবে না, কারণ দিদির সঙ্গে তার এক তিল বনিবনা নেই। তবে রাত্রে সে কোথায় গেল?

অথচ আজ সময় নষ্ট করলে হরিচরণের চলবে না। সে গিয়ে বসলো টেবলের ধারে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে সে একাগ্র মনে সাঁতরে চললো। আজ তার হিসেবের সমস্ত কাজগুলো শেষ করা চাই। এবং এই ভাবে রাত প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত সমস্ত পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে সে হিসাবপত্রের অথৈ নদী সাঁতরে কূলে এসে উঠলো,—তখন তার দুই চক্ষু নিদ্রার রসে টলটল করছে। একবার সে অনুপস্থিত লীলার প্রতি তার অসীম বিরক্তি প্রকাশ করবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলেনা, টলতে টলতে বিছানায় উঠে দু'মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হোলো।

৪

অত রাত্রি জাগার পর সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে হরিচরণের একটু দেরি হলো অবশ্য। আড়ামোড়া খেয়ে একটু আলিস্যি ভাঙ্‌বার চেষ্টা করতেই সহসা সে চমকে উঠলো। চোখ খুলে দেখলে লীলা তার পাশে অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার সেই ঘুমের মধ্যে, তার চোখে, মুখে ভ্রূরেখায় অকুণ্ঠ অসম্বৃত দেহবিস্তারে,—কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ অথবা উদ্বেগ নেই। রাত্রে কখন্ সে ফিরে এসেছে হরিচরণ কিছুই জানে না। রুক্ষ চুলের রাশির অন্ধকারে চাঁদপানা মুখে তার সোহাগভরা নিদ্রা—নিদ্রায় আলুথালু।

কিন্তু নিদ্রিতা নারীর রূপমাধুরী নিঃশব্দে পান করার পরিবর্ত্তে রাগে অন্ধ হয়ে হরিচরণ তাকে একটা ঠেলা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে, পোড়ারমুখি, কাল সারাদিন কোথায় ছিলে শুনি?

লীলা জেগে উঠলো। রাত্রি জাগরণে রাঙা দুই হরিণী-নয়ন। কিন্তু সে পলকের জন্য। তারপরই সে অতিশয় বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার দিব্যি ঘুমোতে লাগলো।

হরিচরণ বললে, অমনি ক'রে চটকাচ্ছো, ভালো কাপড় জামাগুলো নষ্ট হয়ে গেল যে?

কিন্তু স্ত্রীর সাড়া পাওয়া গেল না। এর পরে হরিচরণ রাগ করবে কা'র উপর? অগত্যা বিছানা থেকে নেমে সে বাইরে গিয়ে ডাক দিলে, ঠাকুর, চা দিয়ে যাও।

ঠাকুর চা আনবার আগে সে ঘরে এসে একবার স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গে গায়ের কাপড় টেনে-টেনে ঢাকা দিলে। বললে, এমন বেপরোয়া ঘুম কোথায় শিখলে শুনি? নাও, ওঠো, ঠাকুর চা আনছে।

ক্লান্ত দেহে লীলা এবার উঠে বসলো। হরিচরণ প্রশ্ন করলে, কাল কোথায় ছিলে? রাত্রে ফিরলে কখন্?

সাড়ে তিনটের সময়।—লীলা বললে।

হরিচরণ বললে, একা?

না, জামাইবাবুর ছোট ভাই ছিল সঙ্গে।

কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

আঃ—লীলা বিরক্ত হয়ে বললে, বলছি যে ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলুম বেড়াতে?

কই, একবারো বলোনি।

আচ্ছা বলিনি, হোলো?

হরিচরণ বললে, সেখানে গিয়ে কি করলে?

সেখানে?—লীলা এবার ফিক ক'রে হেসে ফেললে, দোল্না আছে, তাইতে দুলছিলুম দু'জনে। জানো, জামাইবাবুর ছোট ভায়ের গায়ে কী জোর। উঃ আমাকে যা দোলা দিতে লাগলো। আমিও খুব ক'রে তার দোল্না ঠেলছিলুম।

আর কে গিয়েছিল তোমাদের সঙ্গে?—হরিচরণ প্রশ্ন করলে। কিন্তু উত্তর দেবার আগে ঠাকুর দু'পেয়ালা চা এনে হাজির করলে।

মুখ ধুয়ে এসে লীলা গুছিয়ে বসলো। চায়ের পেয়ালাটা হাতের কাছে টেনে নিয়ে দীর্ঘ একটা ভূমিকা ক'রে তার গতদিনের ভ্রমণকাহিনী আনুপূর্ব্বিক আরম্ভ করলে। তার দিদির দেওর কেমন ভালো ছেলে, কেমন তার সুন্দর চেহারা, কতখানি গায়ে জোর,—এই দিয়ে তার কাহিনী সুরু। তারা দু'জনে সারাদিন মোটর চ'ড়ে বেড়িয়েছে, আউটরাম ঘাটের হোটেলে চা খেয়েছে, খিদিরপুরে ডক্ দেখেছে, তারপর গেছে ডায়মণ্ডহারবার। সেখানে চড়িভাতি ক'রে আহার সাঙ্গ করতেই প্রায় রাত বারোটা হয়ে গেল। জামাইবাবুর ছোট ভাইয়ের মতন এমন মধুর স্বভাবের যুবক সে আর দেখেনি।

তারপর?—হরিচরণ প্রশ্ন করলে।

তারপর আমাকে নীরেন এসে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল!

বিদায় সম্ভাষণটা কেমন হোলো?

ক্ষণেকের জন্য লীলা স্বামীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর উঠে গিয়ে তার পিঠের উপর মুখ-

খানা ঘ'ষে বললে, তুমি বুঝি রাগ করলে? রাগ করবে জানলে আমি—

নীরেন কী বললে শুনি?

বলবো না আমি, যাও।

শিগগির বলো বলছি?—হরিচরণ ধমক দিলে কৃত্রিম কণ্ঠে।

স্বামীর মুখের উপর হাতখানা বুলিয়ে লীলা বললে, আমাকে দেখতে খুব ভালো, তাই বললে। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটা কথা রাখবে বলো?

কি কথা?

আগে বলো রাখবে কি না?

হরিচরণ বললে, রাখবার মতন যদি হয়--

খুব রাখবার মতন।—লীলা আদর-জড়িত কণ্ঠে বললে, কিছু টাকা আমাকে দাও।

টাকা? কেন বলো ত?

নীরেনকে আমি দেবো। তার কিছু হাতখরচ নেই, তা জানো?

হরিচরণ স্তব্ধ বিস্ময়ে চুপ ক'রে রইলো। লীলা পুনরায় বললে, কাল আবার নীরেন আসবে, —আমরা কিন্তু কাল আর্ট এক্জিবিশন্ দেখতে যাবো, তা ব'লে রাখছি। বেশি না, দশ টাকা দিয়ো, লক্ষীটি,—কেমন?

নিচে থেকে কে যেন বাইরের লোক হরিচরণকে ডাক দিলে। সে ওঠবার চেষ্টা করতেই লীলা তাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, কিছুতেই শুনবো না আমি, বলো দেবে?

রাগ ক'রে হরিচরণ বললে, আমি টাকা দেবো আর সেই টাকা নিয়ে তুমি—

আমি যে কথা দিয়েছি নীরেনকে?

পরপুরুষের সঙ্গে তুমি বেড়িয়ে বেড়াতে চাও?

সরল সহজ দৃষ্টিতে লীলা স্বামীর দিকে তাকালো। অবাক হয়ে বললে, পর কেন হবে? সে ত জামাইবাবুর ভাই?

নিচে থেকে আবার ডাক এলো। ব্যস্ত হয়ে হরিচরণ বললে, আচ্ছা, আজ ত' আর নয়। সাবধান, কাগজপত্র ছড়ানো রইলো, যেন হাত দিয়ো না। আসছি আমি।—এই ব'লে সে জামাটা গায়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। গেল বটে কিন্তু সে-বেলায় হরিচরণ আর ফিরে এলো না। ইটওয়ালার পাল্লায় প'ড়ে সারাটা দিন মিস্ত্রি-মজুরদের আন্দোলনে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে রইল। স্ত্রীর কথা সে ভুলেই গেল।

রাগে দুঃখে অভিমানে লীলা সমস্ত দিন বিষধর সর্পিনীর মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তারপর এক সময় নিরুপায় হয়ে সে ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ ক'রে দিলে। পিসিমা এসে ডাকাডাকি করলেন কিন্তু সে কিছুতেই সাড়া দিল না। বন্ধ ঘরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে প'ড়ে রইল।

হরিচরণ যখন ফিরলো তখন সন্ধ্যা সাতটা। পিসিমা তীব্রকণ্ঠে সমস্ত ঘটনা তার কাছে বিবৃত করলেন। অনেকদিন পরে আজ সহসা হরিচরণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো, রাগে অন্ধ হয়ে সে উপরে উঠে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললে, খোলো শিগগির দরজা।

স্বামীর গলার আওয়াজ পেয়ে তখনই লীলা দরজা খুলে দিলে। হরিচরণ ভিতরে ঢুকে সুইচ্ টিপে আলো জাললো। তারপর বললে, কেন তোমার এই স্বেচ্ছাচার দিন দিন?

হাসিমুখে লীলা বললে, কেমন জব্দ?

তোমার এই হিষ্টিরিয়ার ভূত আমি ছাড়াতে জানি, তা জানো?—বলতে বলতেই হরিচরণের দৃষ্টি পড়লো ঘরের এক কোণে। সচকিত হয়ে সে বললে, ঘরের মধ্যে অত কাগজের ছাই কেন?

লীলা রাগ ক'রে বললে, তোমার সব কাগজপত্র আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

অ্যাঁ?—এই ব'লে হরিচরণ সেই ছাইগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললে, সর্ব্বনাশি, বাড়ীর সব কাগজপত্র আর হিসেবের যা কিছু এর মধ্যে,—কী করলে তুমি?—মাথা হেঁট ক'রে সে স্তব্ধ হয়ে রইল।

লীলা তার কাছে স'রে এলো। তারপর স্বামীর গায়ের উপর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সহজ সুরে বললে, বেশ করেছি। কেন তখন এই আসছি ব'লে চ'লে গেলে? কেন এলে না সারাদিন? খুব করেছি, বেশ করেছি—এই ব'লে সে হরিচরণের জামাটা খুলে দিতে লাগলো নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে।

অপূরণীয় ক্ষতিতে সর্ব্বস্বান্ত হরিচরণ সহসা স্বভাববিরুদ্ধ উত্তেজনায় এক সময় স্ত্রীকে আক্রমণ করলে। তার চুলের মুঠি ধ'রে পাকিয়ে রোষ-কষায়িত চক্ষে রুদ্ধ কঠিন স্বরে বললে, হতভাগি, কেন এই সর্ব্বনাশ করলি?

কিন্তু লীলা আধুনিক মেয়ে নয়। শান্তভাবে সে তার দুই নিটোল নগ্নবাহু ছড়িয়ে স্বামীকে ঘিরে ধরলো। তারপর একটি অতি উচ্চমার্গের দার্শনিক বক্তৃতা ফেঁদে বললে, আমাকে ছেড়ে তুমি অন্য দিকে মন দাও কেন? কেন তোমার চোখ থাকে বাইরের দিকে? কেন তোমার ঝোঁক ইট-পাটকেলের ওপর?

দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে হরিচরণ বললে, তবে কী চাস তুই?

অশ্রু টলোটলো চক্ষে লীলা হাসলো; তারপর জোর ক'রে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সিঁদুর-মাখানো মাথাটা বুকের কাছে ঘ'ষে, গলার কাছটা লালাসিক্ত ক'রে দিয়ে, রসগদগদ কণ্ঠে বললে, আমি চাই তোমাকে।

প্রগতি

নলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রগতি কাকে বলে—যথার্থ প্রগতি?

মানুষ এক কালে পাথরের হাতিয়ার চালাত—এই পাথরের হাতিয়ার চালাতে বানাতে শিখেই বনমানুষ মানুষে পরিণত হয়েছিল। আবার মানুষ যখন আবিষ্কার করলে লোহার হাতিয়ার তখন মানুষের রাজ্যে এল আর একটা বিপর্য্যয়—মানুষের হ'ল প্রগতি, মানুষ হ'ল সভ্য।

আজ মানুষের হাতে উঠেছে বাষ্পের বিদ্যুতের হাতিয়ার—তাই বলা হয় আজকালকার মানুষ প্রগতির শিখরে, তার সভ্যতার তুলনা নাই।

তাই কি? মানুষের হাতিয়ার দিয়েই মনুষ্যত্বের পরিচয়? কিন্তু আধুনিকের দুই একটি জননেতার রূপ স্মরণ করিয়ে দেয় কেন আদিকালের লগুড় হস্তে "নেয়াণ্ডেরটাল" মানুষ!

প্রগতির আসল পরিচয় হাতিয়ারে নয়, ভিতরের চেতনায়। চেতনা কতখানি গভীর হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে, ঊর্দ্ধায়িত হয়েছে, তাই প্রগতির পরিমাপ। আর চেতনার মহত্ত্বের সাথে থাকতে পারে হাতিয়ারের সারল্য।

চেতনার গভীরতা প্রসারতা সমুচ্চতা অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমারোহ নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমারোহ, বিদ্যাচাতুর্য্য হ'ল হাতিয়ারেরই উৎকর্ষ—মন বুদ্ধির হাতিয়ার। মন বুদ্ধি সহজ সরল—অপণ্ডিত—হ'লেও চেতনা সেখানে গভীর প্রশস্ত সমুচ্চ হ'তে পারে।

দুর্য্যোধন যখন নারায়ণী সেনাবাহিনী চেয়ে নিল তখন তার পছন্দ গেল হাতিয়ারের উপর—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পেলে লাভ করল চেতনার মহত্ত্ব।

সুষ্ঠুতর হাতিয়ার মানুষকে সমর্থতর জন্তু করে' তুলতে পারে—কিন্তু তার প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন সাধন করে না।

প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির বিশুদ্ধিকরণেই মানুষের মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব—তারই চেতনার প্রসারতা গভীরতা সমুচ্চতা। আর এই হ'ল সত্যকার প্রগতি—প্রগতি শুধু সম্মুখে গতি নয়, তা আবার প্রকৃষ্ট গতি। ঊর্দ্ধতর দৃষ্টি দিয়ে গভীরতর অনুভব দিয়ে বিশালতর প্রেরণা দিয়ে মানুষের সত্তা ও জীবন গড়ে' চলাই হ'ল প্রগতির মর্ম্মকথা।

এই রকমের পুরো মানুষ ছাড়া মানব জাতির রক্ষা বা উন্নতি আর কিছু দিয়ে হবে না। এখন মানুষ হ'ল টুটা ফাটা টেরা বাঁকা হালকা পলকা।

নিজেকে যে মানুষ শুধরিয়ে সাজিয়ে নিতে সচেষ্ট—নিজেকে যে সমর্থ পূর্ণাঙ্গ করে' তুলছে, সেই মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণকৃৎ। এ কাজ নিজে ছাড়া আর কেউ করে' দিতে পারে না—নিজেকে দিয়েই নিজেকে উদ্ধার করা ছাড়া, নিজে নিজের আলো হওয়া ছাড়া অন্য দ্বিতীয় পথ নাই।

এই মহাব্রতের সতীর্থেরা সমবেত হোক। তাদের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতের পূর্ণতর মানব জাতি গড়ে' উঠুক।

[২]

শরীরের যে শরীর তাই যদি না পেলাম তবে কি হবে এ শরীর দিয়ে?
প্রাণের যে প্রাণ তাই যদি না এল তবে এ প্রাণ দিয়ে কি করব?
আর মনের যে মন তাই যদি ফুটে না উঠল তবে এমন মন দিয়ে করব কি?

× × × ×

তা, কে সে—এই মনের মন, প্রাণের প্রাণ, দেহের দেহ?

বৃহত্তর জ্ঞান তা, মহত্তর সামর্থ্য তা, নিবিড়তর সত্তা তা—চিন্ময় তপোময় সনয় পুরুষ সে—আমার আমি, আমার দিব্য স্বরূপ, আমাদের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ।

× × × ×

মনকে তার নিজের মধ্যে ডুবতে বল—প্রাণকেও বল ডুব দিতে নিজের মধ্যে—শরীরকেও বল আপনার স্বরূপের মধ্যে আপনি ডুবে যেতে।

দিব্য জীবনের ডুবুরী হও। বিশ্বসৃষ্টির সাগর তলে এই যে মুক্তা তৈরী হয়ে রয়েছে, নিয়ে এস তাকে পৃথিবীর 'পরে সূর্য্যের আলোকে।

সম্পাদকীয়

মহাযুদ্ধের ভূমিকা

যুদ্ধ সুরু হয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মাণীর চুক্তি শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতির চাকা অতি দ্রুত ঘুরে চলেছে। বলদর্পে ক্ষিপ্ত হিটলার ডানজিগ্ ও করিডর কবায়ত্তের অজুহাতে দুর্ব্বল পোল্যাণ্ডের উপর সাংঘাতিক আক্রমণ সুরু করেছে। দুর্ব্বল স্বাধীন জাতির বিরুদ্ধে শক্তিমানের নীতি-হীন নিষ্ঠুরতা ও দানবীয় অভিযান—এই প্রথম নয়। শান্তি ও সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং মানুষের কল্যাণকে উপেক্ষা করে' গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় যে তাণ্ডবলীলা সুরু করেছিলো, গত কয়েক বৎসরের য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে তারই নিষ্ঠুর পুনরাবৃত্তি চল্‌ছে।

এখন রাষ্ট্রনীতি মাত্র হিংস্র শক্তিরই উপাসনায় পর্য্যবসিত হতে চলেছে। এবং এই হিংস্র শক্তির সংঘর্ষে আবিসিনিয়া, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও আলবানিয়ার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত; স্পেনের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা শত্রুপক্ষের লৌহ-কারাগারে সমাধিস্থ।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ সম্রাট এই হিংস্রশক্তির দম্ভেই সদর্পে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সে-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর সমগ্র সভ্যতা ও মানব-সমাজের কাছে যে কত মর্ম্মান্তিক তা' বোধ করি জার্ম্মাণীর থাইতে আর কেউ বেশী করে' জানে না। কিন্তু আশ্চর্য্য, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সেই ঐতিহাসিক আস্ফালন, সেই দাম্ভিক বজ্রনির্ঘোষই আজ হিটলারের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত।

আশার কথা এই যে, হিটলারের এই দম্ভের ধ্বনিতে শেষপর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের ঘুম ভেঙেছে। চেম্বারলেনীয় নীতির এখন কোনো সমালোচনা না করে' আমরা বরং এই ভেবে আশ্বস্ত হ'তে পারি যে, দুর্ব্বলের প্রতি নির্লজ্জ আক্রমণের প্রতিরোধ-করে ইংল্যাণ্ড তার চিরাগুগত লেজুড় ফ্রান্সের সহযোগিতায় দৃপ্তকণ্ঠে নাৎসী বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এবং এই বর্ত্তমান সমরের জটিল ভূমিকাকে আরও দীর্ঘ হ'তে না দিয়ে জলে, স্থলে ও শূন্যে জার্ম্মাণবাহিনীর প্রবল আক্রমণের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। স্তিমিত ব্রিটিশ-সূর্য্য আবার তার শক্তির মধ্যাহ্নে।

রাশিয়া, জাপান, ইটালী ও আমেরিকা এই মহাযুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে নীরবতার ভূমিকা গ্রহণ করে' স্থির হয়ে আছে। জানিনা, গোপনে কূট-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে তারাও নিজ-নিজ শক্তির বারুদ বৃদ্ধি করছে কিনা। হয়তো শেষপর্য্যন্ত স্বার্থের খাতিরে সকলকেই এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে হবে—কারণ, জগতে অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হ'লে কোনো না কোনো সময়ে সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবেই। আর, রাষ্ট্রনীতির নাম্নে দুর্ব্বলের স্বাধীনতার উপর প্রবলের যে অমানুষিক অত্যাচার গত তিন বৎসর যাবৎ অবলীলাক্রমে এগিয়ে চলেছে, তার বিভীষিকাময় চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সমগ্র সভ্যতাকে প্রতিমুহূর্ত্তে আতঙ্কে শিহরিত হ'তে হবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও জার্ম্মাণী

জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা ইতিহাসের একটু অদ্ভুত জটিল অধ্যায়। এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার সঙ্গে সমগ্র জার্ম্মাণ-জাতির কোনো আন্তরিক "সায় ও সম্মতি আছে কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্রনীতিক ধুরন্ধরেরা বলেন, কাইজার ও তাঁর প্যান্-জার্ম্মাণ লীগের সঙ্গে হিটলারের রাষ্ট্র-পরিকল্পনায় মূলতঃ বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কাইজারের বিরাট রাজ্য-বিস্তৃতির স্বপ্ন একদা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মতো প্রবল পরাক্রমশালী শক্তিসমূহের হাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছিলো—আর, আজও হিটলারের কর্ম্মসূচীর অনতিক্রম্য বিঘ্ন—ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। কাইজার সেদিন অপরিহার্য্য স্বার্থের অজুহাতে তাঁর অদম্য উৎসাহ ও আয়োজন নৌ-শক্তি বৃদ্ধিতে নিয়োজিত করেছিলেন—আর সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ড সেই নৌ-শক্তি সীমাবদ্ধ করবার জন্য জাপানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হ'ল। কাইজার যুদ্ধ করতে রাজী হ'লেন এবং তারপর রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে গত মহাযুদ্ধ এক শোচনীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করলো।

ভাগ্যের কুটিল গতিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' জার্ম্মাণী আজ আবার এক মহাযুদ্ধের সম্মুখীন। নব-সাম্রাজ্যবাদী হিটলার সেই একই দাম্ভিক প্রেরণায় বিরাট রাজ্য-বিস্তারের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ—আরও ষোলো কোটি জার্ম্মাণ রক্তজাত সৈনিকের স্বপ্নে বিভোর।

তবে, গত মহাযুদ্ধের সঙ্গে বর্ত্তমান যুদ্ধের পার্থক্য আছে অনেকখানি। সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্বন্ধে ছোটো বড় প্রত্যেকটি উপনিবেশ আজ সম্পূর্ণ সচেতন—প্রত্যেকেই তার ন্যায্য দাবী কড়ায় গণ্ডায় বুঝে পেতে চায়। আর,—পশুশক্তির মূলধন নিয়ে যে ফ্যাসিজ্‌ম ষোলো কলায় পূর্ণ হ'তে চলেছিলো তারও উচ্ছেদ-কামনায় প্রত্যেকেই আগ্রহান্বিত।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক্ না কেন, সমগ্র জার্ম্মাণ-জাতির মধ্যে শীঘ্রই নাজিইজ্‌মের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। হিটলার বোমা বারুদের গর্জ্জন ও বিষ-বাষ্পের গন্ধের মধ্যে তাঁর সর্ব্বগ্রাসী স্বপ্নকে শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীভূত করে' রাখবেনই—এবং একথা নিশ্চয় করে' বলা যায় যে, তার ফলে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনীতিতে আর একটি নব-চৈতন্যের উদয় হবেই হবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও পোল্যাণ্ড

বর্ত্তমান যুগে দুর্ব্বলের নিজ স্বাধীনতা-রক্ষার নাম lunacy—অর্থাৎ পাগলামি। অন্ততঃ নাৎসী-নেতার অভিধান তাই বলে। পোল্যাণ্ড বিনাসর্ত্তে জার্ম্মাণীর করালগ্রাসে 'ডানজিগ'কে এগিয়ে দেয়নি—এই অপরাধে নাৎসী নেতা হের হিটলার পোল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ সুরু করে' দিয়েছেন। সম্প্রতি পোল্যাণ্ডে নাৎসী বর্ব্বরতার যে তাণ্ডবলীলা চলছে, তার প্রতিকার ও পরিসমাপ্তির জন্য গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স্ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সমগ্র পোলজাতি দুর্জ্জয় সাহস ও বিমান-চালনার কৃতিত্ব নিয়ে বিরাট জার্ম্মাণবাহিনীর মারাত্মক আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিচ্ছে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে এর আগে পোল্যাণ্ড যে চরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে, য়ুরোপের অন্য কোনো দেশকেই তেমন তীব্র দুঃখের আস্বাদ পেতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে

পরপর তিনটি চুক্তিতে পোলিশ গণতন্ত্রকে প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে' নিয়েছিল। নেপোলিয়নের পোল্যাণ্ড দখলের পরে ১৮০৭ থেকে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মন্দভাগ্য জাতি অর্দ্ধস্বাধীনতা লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করে। কিন্তু, ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পতনের পরই আবার সেই ত্রিশক্তি অর্থাৎ প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়া পোল্যাণ্ডকে পূর্ব্বের মতই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে' নেয়। সেই থেকে গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল গোল-জাতির রক্তে পরাধীনতার গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়। এই এক শতাব্দী ধরে' পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে অজস্র দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে তা' ইতিহাসে বিরল। তারপর, গত মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে' মার্শাল পিলসুডস্কি পোল্যাণ্ডের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করেছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে পোলিশ সীমান্তে একা পোল্যাণ্ডকেই জার্ম্মাণীর সবরকম আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হচ্ছে। সেখানে সে সহজে আর কারও সহায়তা পাবে বলে' মনে হয় না। যে কারণেই হোক্, রাশিয়ার সাহায্য তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। তবুও, পররাজ্য-লোভের যে নিষ্ঠুর লীলা দিন দিন অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলেছে, তার প্রতিকার-কল্পে জার্ম্মাণীর মতো পরাক্রমশালীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পোল্যাণ্ড মানুষের জন্মগত অধিকারের প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা দেখিয়েছে—একথা আজ আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে।

ভারত-রক্ষা অর্ডিন্যান্স্

য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এ দেশীয় ছোট বড় ব্যবসায়ীরা দেশী ও বিলাতী সবরকম পণ্য-দ্রব্যের দাম অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। নায্য মূল্যে কেনা যে-সব জিনিষ আগে থেকেই তাদের নিকটে মজুত ছিল, সেই সব জিনিষের দাম মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংবাদেই দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। যুদ্ধের সময় উপযুক্ত পরিমাণে মাল আমদানী নাও হতে পারে এই আন্দাজের জোরে মজুত-মালের এবং ভারতেই উৎপন্ন দ্রব্যের দাম এখন থেকেই কি করে দ্বিগুণ হতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়ে মজুত মালের উপর চতুর্গুণ লাভের লোভে যারা ব্যস্ত তারা আর যাই হোক প্রকৃত ব্যবসায়ী ত নয়ই, উপরন্তু দেশের সর্ব্বনাশী শত্রু।

সম্প্রতি ভারত-রক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে বাঙ্‌লা গভর্ণমেণ্ট আদেশ জারী করেছেন যে, যদি কোনও ব্যবসায়ী কোনও ক্রেতার নিকট থেকে লোহা-লক্কড়, মিলের জিনিষপত্র, দৈনিক ব্যবহারের জিনিষ, মোটর গাড়ী ও তার সরঞ্জাম এবং আরও কতকগুলি জিনিষের এক সপ্তাহ আগে যে দাম ছিল তার অতিরিক্ত মূল্য নেয় তা'হলে তা'কে স্থানীয় থানার হেড কনেষ্টবল এবং তার উচ্চপদস্থ যে-কোনো পুলিশ কর্ম্মচারীর সাহায্যে গ্রেপ্তার করা হবে।

জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূলে অবিলম্বে নজর দিয়ে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তা' তাঁদের শুভবুদ্ধির পরিচায়ক।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও কংগ্রেস

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলকাতায় শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন হ'য়ে গেল। সভাপতি শ্রীযুক্ত আনে তাঁর অভিভাষণে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি তথা গান্ধীজীর কাছে যে আন্তরিক আবেদন জানিয়েছেন তার ফলাফল সম্বন্ধে আমরা এখন থেকেই কল্পনা করতে পারি।* কারণ, আমরা স্পষ্টই জানি, কংগ্রেস তার কায়েমী স্বার্থের খাতিরে সহজে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ত করবেই না, বরং পরোক্ষভাবে তার 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন' নীতির দোহাই দিয়ে বিশেষ করে' বাঙ্‌লা ও পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক কলহের অগ্নিতে ইন্ধন জোগাতে বদ্ধপরিকর।

বাঁটোয়ারা-সম্পর্কিত ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রকৃত মনোভাব আমরা অর্থাৎ বাঙালীরা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করে' তবে এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছি। এবং আমাদের এই সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ় হয়, যখন শুনি: প্রত্যক্ষভাবে বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করলে জন-মনের জাতীয়তা-বোধ পঙ্গু হবে এবং এই সমস্যার সমাধান আমাদের একান্তই ঘরোয়া ব্যাপার—সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই! মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থ ও সুবিধের বিনিময়ে জাতীয়-দাবীকে এই ভাবে তুচ্ছ নিলামে তুলে দেওয়া একমাত্র বর্ত্তমান কংগ্রেসের পক্ষেই সম্ভব!

অতদিন কংগ্রেসের মুখ তাকিয়ে এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া আমরা নীরবে সহ্য করেছি। নব্য শাসনতন্ত্রের সামান্য ভিক্ষাকে পরম প্রসাদ মনে' করে' যাঁরা কৃতার্থচিত্ত—তাঁরা থাকুন সুবিধাবাদ ও নিয়মতান্ত্রিকতার উঁচু আসনে। তথাকথিত এই সব নিয়মতান্ত্রিক ক্রুর-কৌশলীদের সংস্পর্শে না থেকে দেশের ও জাতির বৃহত্তর আদর্শ ও স্বার্থের জন্য আমাদের একটি সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ পৃথক কর্ম্মসূচীর সম্মুখীন হ'য়ে এই বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তীব্রতর সংগ্রাম চালাতে হবে। সুতরাং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বার-বার অধিবেশন ও আবেদন-নিবেদন জানিয়ে কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হওয়ার আর কোন মানে হয় না।

অন্নপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

আধুনিকতা ও য়ুরোপীয় চিত্রকলা

জ্যোতির্ম্ময় রায়

সময়ের সঙ্গে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য—গতি তার দ্রুত বা মন্থর যা-ই হ'ক। মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী-কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত সমাজে, রাষ্ট্রে ও শিল্পে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে বিগত কয়েক শতকের তুলনায় সেটা অতি দ্রুত ও বিস্ময়কর। এসব ক্ষেত্রে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের তুলনামূলক মূল্য নিরূপণের চেষ্টা সম্পূর্ণ অর্থহীন; কারণ পরিবর্ত্তন যখন চলতে থাকে এবং নূতনত্ব প্রবর্ত্তনের চেষ্টা স্পষ্ট হ'য়ে চোখের সামনে কেবলই ধরা দেয় তখনকার সময়টা গঠনমূলক, সেই নূতনত্ব যখন আবার জন-মনে কিছুকালের জন্যে স্থায়ীভাবে স্থান করে' ন্যায় তখন তাকে সময়োপযোগী বলে' মেনে নিতেই হবে। প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তনের পেছনে রয়েছে প্রয়োজনের তাগিদ, সে-তাগিদ অজ্ঞাতসারে জন-মনের অবচেতনায় জন্মলাভ করে, চিন্তাশীলদের যুক্তির উপকরণে হয় তার পুষ্টি, প্রতিভাবানের ধাত্রীত্বে হয় তার জন্ম—যাকে বলি আমরা যুগস্রষ্টা। উপস্থিত বিশ্বের চিন্তাধারায় চলমান পরিবর্ত্তনের মধ্যে নূতনত্ব প্রবর্ত্তনের প্রয়াস নয়ভাবে ফুটে উঠে শুধু ইঙ্গিত করছে ভাবাবেগবর্জ্জিত ধারালো বুদ্ধির শান্তিহীন অস্থির চঞ্চলতা। এটা বিদ্রোহের যুগ, তাই সর্ব্ববিষয়ে মাথা তুলে আছে একটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ অস্বীকৃতি।

পুরাতনের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞাতান্ত্রিকতার এই অভিযান রূপ ও রস সৃষ্টির জগতেও অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছে। যদিও চিত্রশিল্প আমার আলোচ্য বিষয় তথাপি তুলনামূলকভাবে উপস্থিত বাংলাদেশের কবিতার উল্লেখ এক্ষেত্রে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আধুনিক গদ্যকবিতা প্রভাবমুক্ত স্বকীয় বস্তু যদিও নয় তবু রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠবার অস্ত্র হিসেবেই এটা যেন সার্থক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই আজ আবার তাই নূতন উদ্যমে নূতন করে' কবিতা নিয়ে আলোচনা ও চর্চ্চা চলছে এবং কবি কথাটা কবিগুরুছাড়া অন্যের স্কন্ধে আরোপ করলেও মানুষের মনে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসির উদ্রেক করে না। আধুনিকতম কবিতাগুলোর মধ্যে কতক আছে যার ভাষার দেয়াল ডিঙিয়ে ভাবের ঘরে ঢোকাই কঠিন, কতক আছে যার ভিতরে টুকরো টুকরো ভাবের মাঝে থাকে এক একটি ব্যাদিত ব্যবধান যার তুঙ্গ-স্থানের সামনে এসে সাধারণ পাঠক থমকে থেমে পড়ে, দীমানরা দী-র ডগায় ভর করে' টপকে গিয়ে কৃতিত্বের আনন্দে হয়ে ওঠে মসগুল। কতক আছে যেগুলোকে কবিতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অতি আধুনিক চিত্রশিল্পের মধ্যেও অনুরূপ প্রচেষ্টারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কতক সার্থক হয়ে উঠতে চাচ্ছে শুধু পুরাতন পদ্ধতিকে অস্বীকার করে', কোথাও শুধু পাকা তুলি-কলমের ভেল্‌কিবাজি, কতক সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্যহীন—দাঁড়িয়ে আছে দুর্ব্বোধ্যতার স্পর্দ্ধা নিয়ে। কবিতায় কবিতাকে খুঁজে বেড়াতে হবে, ছবির মধ্যে দেখবার, গানের ভিতর শুনবার মত যখন কিছু থাকে না (থাকে যা সব বুঝবার) তখন তাকে উচ্চাঙ্গের বলে' স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় কি!

অবিশ্যি একথা সত্যি, একটা স্তর আছে যেখানকার রূপ বা রসোপলব্ধির জন্যে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকে রীতিমত শিক্ষার মধ্য দিয়ে তৈরী হতে হয়, সে-স্তরে, একথাও আবার তেমনি ভাবে সত্য, যে সেই

উচ্চাঙ্গের ভাবের যে বাহন হবে তার সম্মানও সর্ব্বতোভাবে বজায় না রেখে চললে প্রকাশ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে কখনই বলা চলে না। কবিতার মারফৎ কবিত্ব, চিত্রের মারফৎ চিত্রত্ব, সঙ্গীতের মারফৎ হ'লে সুর-মাধুর্য্য বজায় রেখে চলতেই হবে। য়ুরোপীয় চিত্রজগতে পিকাসো, হেন্‌রী মুর এবং এ-শ্রেণীর অন্যান্য চিত্রকরদের অনেক চিত্র আছে যা চিত্রজগতকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে এখনই নির্দ্দিষ্ট করে' বলা কঠিন। পাকা স্রষ্টার পক্ষেই পাকামো সম্ভব সে কথা সত্য, কিন্তু এ পাকামোর মূল্য কতটা সেটাই হ'ল প্রশ্ন। একশ্রেণীর সমালোচক আছে যারা স্রষ্টার বড়ত্বের ভিৎ-এর উপর দাঁড়িয়ে তার একটা খামখেয়ালের প্রতি পর্য্যন্ত সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য দেয় এবং দেশের অন্যান্য লোক এ দুর্ব্বোধ্য বস্তু কতদিন পরে বুঝবে তার জন্যে একটা সময়ের নির্দ্দেশ

একখানি দুর্ব্বোধ্য ছবি

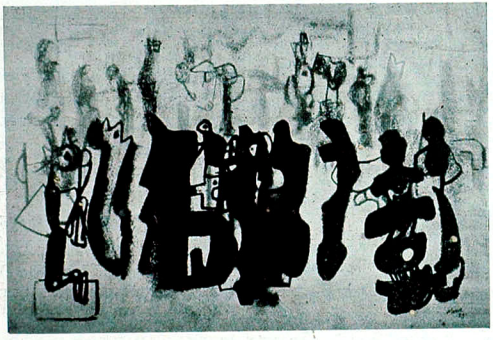

শিল্পী—হেন্‌রী মুর

দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে' আত্মশ্লাঘা বোধ করে। খেই-হারানো একটা ভাবকে ফেনিয়ে তোলবার চেষ্টাও এঁদের মধ্যে অসীম। মোনালিসা চিত্রের শুধু অভিব্যক্তির জটিলতা নিয়ে এ জাতীয় সমালোচকেরা বহুকাল ধরে' কম মাতামাতি করেনি। সাদা-কালো-নীল-সবুজ এমনি কতকগুলো রং মিশিয়ে ছেড়ে দিলে যেমন বলা অসম্ভব সেটা কি রং তেমনি সংমিশ্রিত একটা আবছা অভিব্যক্তির মধ্যেও নির্দ্দিষ্ট ভাব খুঁজতে গেলে খেই হারানোই তো স্বাভাবিক; এবং এই জটিলতা ইচ্ছাকৃত না হয়ে আকস্মিক হওয়াও অসম্ভব নয়।

যান্ত্রিক-যুগের পরীক্ষাগারে-বস্তুতান্ত্রিক মনের এই যদৃচ্ছা-পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সময়ের ছাঁটাই-বাছাই-এ টিকে গিয়ে শিল্পজগতে সত্যিকারের সম্পদ হিসেবে বেঁচে থাকবে কিনা তা নিয়ে জোর করে' এখন কিছু বলতে না যাওয়াই ভাল, কারণ শুধু গলা বা বলার জোরে বলবার সুবিধা যেখানে আছে সেখানে হ্যাঁ,

না দু'-এর জোরই সমান। এ-প্রবন্ধে আইডিয়াল, ইম্‌প্রেসান বা এক্সপ্রেসান ইত্যাদি ইস্‌মের ইতিহাস বা বিশ্লেষণের মধ্যে প্রবেশ করবার আগে মোটামুটি ভাবে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কিছু বলব।

সংক্ষিপ্ত অবলম্বনের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত ভাব-প্রকাশের উপরই নির্ভর করে শিল্পীর কৃতিত্ব, অবলম্বন তার ভাষা, রেখা, রং, আলো-ছায়া যাই হ'ক না কেন। খুবই স্বল্প রেখার ভিতর দিয়ে কোন বস্তু বা ব্যক্তি-বিশেষকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারার সাফল্য নির্ভর করে শিল্পীর রেখা নির্ব্বাচনের উপর। যে ক'টি রেখায় বস্তু বা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করছে শুধু সে কয়টি রেখা বাছাই করে' নিয়ে তারই উপর ভর করে' রেখাচিত্র গড়ে' ওঠে। শুধু বৈশিষ্ট্যটুকু বাঁচিয়ে রেখে সেই রেখা ক'টি বিকৃত করে' বস্তু বা

"শেল"-এর জন্য অঙ্কিত একখানি পোষ্টারের নমুনা

শিল্পী—মেড্রিক্ মরিস

ব্যক্তির কোন একটা ভাবকে হাস্যোদ্দীপক করে' তোলাই হ'ল ব্যঙ্গচিত্র। দু'টোর মধ্যেই তুলির গতির সহজতা ও রেখার স্বল্পতা লক্ষ্য করবার বিষয়।

চিত্র-সৃষ্টির মূলে প্রথমতঃ শিল্পীর দৃষ্টি-ভঙ্গী—শিল্পী কোন্ বস্তুকে কি ভাবে দেখছে। জীব ও প্রকৃতি মানুষের চোখের সামনেই ভেসে বেড়াচ্ছে, সেই ভাসমান বিশ্ব দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ, ব্যাপ্তির ব্যগ্রতা তাই সার্থক হয় শিল্পীর মুক্ত পরিস্ফুত দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। নিত্য নূতন রূপ নিয়ে বিশ্ব শিল্পীর চোখে ধরা দেয়—তার অভিনবত্ব ও অসীমত্ব প্রচারের সবচেয়ে বড় এজেন্ট হলো শিল্পী। এই উপলব্ধিকে চিত্রকলার ভিতর দিয়ে রূপায়িত করে' তুলতে সহায়তা করে তার রচনা পদ্ধতি (Composition) ও চিত্রের ভারসাম্য। রং ও তুলির টেকনিক সেই কাঠামোকে অবলম্বন করেই ফুটে ওঠে। কোন্‌টা কোথায় কতটা কি ভাবে ফেলতে হবে তা নির্ব্বাচনের উপরেই নির্ভর করে শিল্পীর রচনা শক্তি; চিত্রের

ভারসাম্য নষ্ট হ'লে ফ্রেমের মধ্যে তা' কাত হয়ে যায় না বটে কিন্তু দর্শকের মনের মধ্যে সেটা কাত হয়ে পড়ে। চিত্রকলার আর একটি বিশেষ গুণ হ'লো তার স্বাভাবিকত্ব, যে গুণাগুণ সাধারণের চোখে সর্ব্বপ্রথমেই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। স্বাভাবিক-মা হবে ছবির মত, ছবি হবে স্বাভাবিক—সাধারণের সৌন্দর্য্যবোধ এই চায়।

চিত্রকলায় 'ফটোগ্রাফিক য়্যাকিউরেসি' দাবী করার কোন প্রশ্নই আসে না, তা' ব্যক্তি-বিশেষের চেহারা বা প্রাকৃতিক দৃশ্য যা-ই হ'ক না কেন। অন্ততঃ বুদ্ধি দিয়ে চিনতে না হয় বিষয়-বস্তুর সেটুকু বৈশিষ্ট বজায় রেখে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী, রচনা পদ্ধতি, রং এবং তুলির টেকনিক দেখাবার থাকে অবাধ অধিকার। ফটোও প্রতিচ্ছবি, চিত্রও তাই; কিন্তু একটার সঙ্গে আর একটার সামান্য তুলনা টানতে গেলে বা অঙ্কিত চিত্রে 'মানুষের হাতের তৈরী' এ-কৃতিত্ব আরোপ করতে গেলে চিত্রকর অপমানজ্ঞানে মর্ম্মাহত হন। ক্যামেরা যা দেয় তাও ভাববর্জ্জিত নয় এবং সে কেবল একই বস্তু দিয়ে চলে না যদিও প্রকৃতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে' নিজস্ব কোন বিষয়-বস্তু গড়ে' তুলবার ক্ষমতা তার নেই। নকল করবার ক্ষমতা আছে কিন্তু স্বাধীনতা নেই—মানুষে আর মেশিনে সে তারতম্য সর্ব্বক্ষেত্রেই আছে। ফটোর সঙ্গে চিত্রশিল্পের তুলনা আমি করছিনে, শুধু এ-কথাটা বলতে চাই যে অনেককথানি কৃতিত্ব তাকে দেওয়া হয় কেবল হাতের-কাজ হিসেবে। দুর্লভ অভিব্যক্তিসম্পন্ন ফটো ও চিত্র দুই-ই হ'তে পারে, ফটোতেও কৃতিত্ব অভিব্যক্তার—চিত্রে চিত্রকরের; এবং হাতের কৃতিত্ব বজায় রাখবার জন্যে চিত্রে ফটোর ফিনিস দেওয়াটা চিত্রকলাসম্মত নয়। সেই ফিনিস দেওয়ার ক্ষমতাটা অবহেলার নয়—অবান্তর। সহিষ্ণু সাঁতারুর ভাসমান মাথাটি এক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে যে বাহবা দিই তার পেছনে থাকে তিন বা তদোধিক দিন ক্রমাগত জলে ডুবে থাকার ইতিহাস; আশেপাশে উৎসাহদাতাদের বহু মাথা ভেসে থাকে, দেখতে এক হলেও সে-প্রশংসা হতে তারা বঞ্চিত।

চিত্রকলার আলোচনায় 'কমার্সিয়াল আর্টের' বিশিষ্ট স্থানটি আধুনিক জগতে অস্বীকার করবার উপায় নেই। যন্ত্রদানবের হাতের মুঠোয় বেঁচে থাকবার আকুলি-বিকুলি চেষ্টার মধ্যে 'ফাইন আর্ট'-ই বরং গেছে তলিয়ে, প্রয়োজনের তাড়নায় 'কমার্সিয়াল আর্ট' দিনের-পর-দিন করছে উৎকর্ষ লাভ। কারণ সেটা অবসর বিনোদন বা বিলাস নয়, জীবন-সংগ্রামে আত্ম-প্রতিষ্ঠার অবলম্বন স্বরূপ। বিজ্ঞাপনের চিত্রে আধুনিক শিল্পীদের দান প্রশংসনীয়। বেকার মধ্যবিত্ত যুবকের চেয়েও কঠিন দ্বন্দ্ব করতে হয় বিজ্ঞাপনকে টি'কে থেকে নিজেকে একটু সামনে এগিয়ে ধরবার জন্যে। দেয়ালে সাবানের বিজ্ঞাপন পড়তে না পড়তেই তার উপরে লেই লেপন করে' চেপে বসলো কেশতৈল, তার ঘাড়ে চাপলো হয়তো সিনেমা। একটা দুষ্টু ছেলে এসে সব ক'টার পেটের মাঝখানটা দিল হয়তো ছিঁড়ে—এরই মধ্যে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে' যেটুকু বলবার তাকে বলতে হবে। মাসিকের বুকে পিঠেও ভীড়ের মাঝে গুটিসুটি বসে' থাকতে হয় তাকে একটি শুভলগ্নের অপেক্ষায়। তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যবসায়ীকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে বলে' আর্থিক জগত হতে এ-শিল্পচর্চ্চা পাচ্ছে অযাচিত উৎসাহ, সেই উৎসাহের ফলে শক্তিশালী শিল্পীদের হাতে এই শ্রেণীর আর্ট আজ পৃথিবীর বুকে সর্ব্বত্র চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। এ প্রবন্ধে যে পোষ্টারের ছবিটি দেওয়া হয়েছে তা থেকে য়ুরোপীয় কমার্সিয়াল আর্টের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

'সেল্' কথাটি লোক-চোখে ধরে' দেবার কি অদ্ভুত কৌশল—রূপ ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসনীয় সমাবেশ। "She" শব্দটা ছবির উপর স্পষ্ট হয়ে ভেসে আছে দৃষ্টিকে প্রথমেই আকর্ষণ করে', তার নীচে রয়েছে একটি ঝিনুক। ঝিনুকের উপর "She"-র আবির্ভাবের কারণ খুঁজতে গিয়ে মুহূর্ত্তে প্রজাপতির পাখার আড়ালে গোপন দুটি আখরের গোঁফের ফাঁকে যে দুষ্টু হাসি খেলছে, তা' ধরে' ফেলা যায়—শিল্পীর চেষ্টা তখন সার্থক হয়ে গেছে।

য়ুরোপীয় চিত্র-শিল্পের কথা আলোচনা করতে গেলে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে সুরু করতে হয় যখন কোয়াটরো-সেন্টিস্ট শিল্পীরা তিন ডায়মেনসান্-এ ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছিল। তার পূর্ব্বে ছবির পট-ভূমিকা সমতল ছিল বললেই চলে, এবং রং-এর মধ্যে সোনালী রং-এর প্রাচুর্য্যই ছিল বেশী। কিন্তু যেদিন থেকে তাদের মধ্যে পারস্‌পেক্‌টিভ্ বোধ জাগলো সেদিন থেকে তৃতীয় ডায়মেনসান্ এসে চিত্রজগতে স্থান নিল, তার পূর্ব্বে চিত্রে গভীরতা ফুটিয়ে তুলবার কোন আভাস পাওয়া যায় না। তিন ডায়মেনসান্‌কে চিত্রকলার ভিতরে ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস দেখা দেবার পর হতেই সুরু হ'লো রিনাইসেন্স-এর যুগ। সেই চেষ্টার পরিণতি দেখা যায় ব্যারক-এর মধ্যে। তিনটি শতাব্দী ধরে' এ-চেষ্টাই চলে' আসছিল, পরে ইম্‌প্রেসনিস্টিক স্টাইল এসে চিত্রজগতে আবার এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করলো। এ নূতন প্রচেষ্টায় ডায়মেনসান্ বা বস্তুর আবয়বিক গঠন গেল পেছনে পড়ে', আবছা একটা রং-এর প্রভাবই দেখা দিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে। এইবার রসানুভূতিতে দেখা দিল প্রবল ভাবপ্রবণতা। বস্তু জগতের খুঁটিনাটিকে চিত্রে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা গেল লোপ্ পেয়ে, রং-এর মধ্যস্থতায় ভাবকে ফুটিয়ে তুলবার মধ্যেই হ'লো সে-যুগের বৈশিষ্ট। কিন্তু এই রং-এর খেলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রমশঃ ঘনিয়ে এল, শিল্পীদের আবার নজর পড়ল অবয়বকে নিখুঁত করবার দিকে। এই থেকেই হলো একস্‌প্রেসানিস্‌মের উদ্ভব। কিন্তু তখনকার শিল্পীদের আঙ্গিক গঠনের সঙ্গে বাস্তব জগতের গঠনপ্রণালীর তেমন মিল ছিল বলা চলে না। শিল্পীর মানসলোকে যে বস্তু যে রূপ নিয়ে ফুটে উঠতো শিল্পী তাকে সে ভাবেই রূপায়িত করে' তুলতো তার চিত্রে। বাহ্যিক দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে ভাবলোকের বৈসাদৃশ্য ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে সৃষ্টি করলো য়্যাবস্ট্রাক্ট-আর্টের। তখন ভাবের বাহন হয়ে দাঁড়ালো কতকগুলো প্রতীক—যাকে অবলম্বন করে' রূপ ও রস পরিবেশনের আয়োজন চললো। পোষ্ট একস্‌প্রেসানিস্‌মের যুগে য়্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের নোঁয়াটে ভাব গেল কেটে, শিল্পীরা চোখ মেলে দৃশ্যমান জগতকে বরণ করে' নিল তাদের অন্তরলোকে এবং বাস্তবকে বজায় রেখেই রূপ ও রসে সমৃদ্ধ করে' তুললো। যদিও প্রকৃতির প্রত্যেকটি তুচ্ছ অংশ পর্য্যন্ত চিত্রে এসে ধরা দিতে লাগলো, তবু মনে হতে লাগলো তাদের রূপ যেন শোধন করে' নেওয়া হয়েছে—বস্তুতান্ত্রিকতা ও আদর্শবাদের মিলন হ'লো। মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এটুকুই হ'লো য়ুরোপীয় চিত্রকলার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পরবর্ত্তী কাল হতে মডার্ণ ইস্‌ম সুরু। ও-দেশের আধুনিক চিত্র-শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই আসে প্যাব্‌লো পিকাসোর নাম; অতি আধুনিক চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে তাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে—অবিশ্যি জার্ম্মান এপস্‌টাইনও কম ন'ন।

১৯২০ সালে পিকাসো তাঁর শিষ্য ও স্তাবকের সংখ্যা দেখে নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলেন। সে-সময় তাঁর কাজ নিয়ে Morning Post এতটা মাতামাতি সুরু করেছিল যাকে ইংরিজীতে বলে

'braying of an ass in a garden city.' বিখ্যাত এই স্প্যানিস চিত্রকর প্রথম তাঁর শিল্পী-জীবন সুরু করেন প্যারিসের এক বিরাট চিত্রশালায়। তাঁর এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল, জ্যোতির্বিদ্যার নক্সার উপর এক তারা থেকে অন্য তারায় লাইন টেনে বিবিধ আকারের ত্রিকোণ সৃষ্টি করা (এরই অনুকরণে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও কবিতার লাইন কাটাকুটি করতে গিয়ে চিত্র সৃষ্টি সুরু করেন), সেই

একটি বালিকা (তৈলচিত্র)
শিল্পী—অগাষ্টাস জন্

ত্রিকোণগুলির সংমিশ্রণ থেকেই কিউবিস্‌ম—এই কিউবিস্‌ম থেকে সুরু করে' সাররিয়ালইস্‌ম পার হয়ে তিনি গিয়ে পৌছান নিও-ক্ল্যাসিজ্‌মে।

স্প্যানিস গৃহ বিপ্লবের সময় দেশহিতৈষী এই বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী মাদ্রিদের Prado Museum-এর ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ফ্রাঙ্কো, কিছুদিনের মধ্যেই স্পেনের কর্ত্তৃত্ব তাঁর হাতে আসবে এই দৃঢ় বিশ্বাস

তৃষ্ণার্ত্ত (ভাস্কর্য্য)
শিল্পী—পিটার হেন্‌রিক্

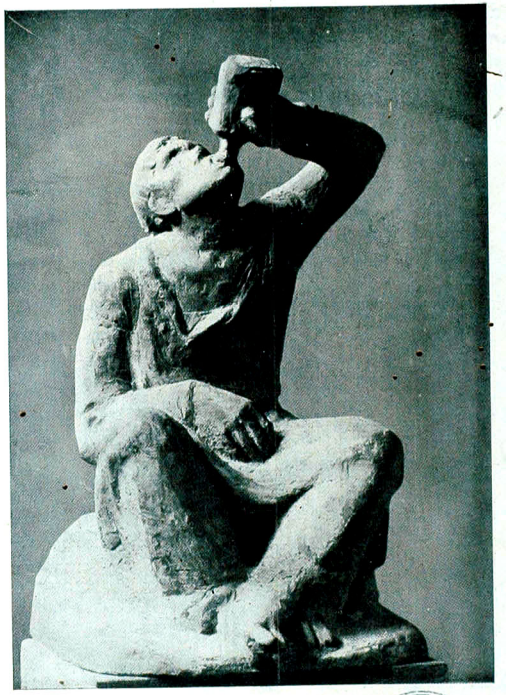

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

থেকে পিকাসোকে একই সম্মান দানে কৃতার্থ করবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু চিত্র-শিল্পী তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সে সময়কার তাঁর বিখ্যাত চিত্র হ'ল Guernica, চিত্রখানা আঁকা হয়েছে ২৫০ স্কোয়ার ফুট ক্যানভাসের উপর। 'পিকাসোর এই Bombing of Guernica চিত্রে কিউবিস্‌ম, সারিয়ালিস্‌ম ও নিও-ক্ল্যাসিকের সংমিশ্রিত প্রভাব বিদ্যমান। চিত্রের বিষয়-বস্তুর মধ্যে একটি ষাঁড়, একটি ঘোড়া, শিশুসহ একটি স্ত্রীলোক ও কতকগুলো পুরুষের মূর্ত্তি—আশেপাশে তাদের উল্টে-পাল্টে পড়ছে সব কিউবিষ্টিক দেয়াল এবং মূর্ত্তিগুলোর ভাবে ও ছন্দীতে বিভিন্ন পরিমাণ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

অতি আধুনিক যে সকল চিত্রকে উদ্ভট, অদ্ভুত ও দুর্ব্বোধ্য বলে' আমি মতামত প্রকাশ করে' এসেছি উপরোক্ত চিত্রখানাও সেই পর্য্যায়ভুক্ত। পিকাসোর চিত্রগুলো ওরকম বলেই অতি আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার উদ্ভটত্ব ও দুর্ব্বোধ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বিষয়ে বিশেষভাবে এবং বেশী করে' উল্লেখ করতে হ'লো।

পিকাসো প্রমুখ শিল্পীগণ চিত্র-জগতে এ জাতীয় যে পরিবর্ত্তন এনেছেন তাকে পরিবর্ত্তন না বলে' বলা চলে এক্সপেরিমেণ্ট। শুধু চিত্র-শিল্পে কেন, সামাজিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এটা শুধু পরিবর্ত্তনের যুগ নয় পরীক্ষারও যুগ—প্রয়োজনীয়তার কষ্টি-পাথরে কষে' সময় কোন্‌টা রাখবে কোন্‌টা ছেঁটে ফেলে দেবে সে-সম্বন্ধে আমরা যুক্তির জোরে পারি শুধু আন্দাজ্ করতে।

শারদীয় সংখ্যা 'পত্রিকা'

চিন্তাশীল সুধীবৃন্দ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও সচিত্র রস-রচনা এবং বহু বিখ্যাত শিল্পীর চিত্র-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে এই শোভন সংস্করণখানি বর্দ্ধিত কলেবরে আগামী মহালয়ার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হবে।

প্রগতি-সাহিত্য ব্যাপারটা আমার কাছে অর্থহীন বলে' মনে হয়। এবং প্রগতি-সাহিত্য বাদীরা যে বলে' থাকেন যে বস্তী-জীবন নিয়ে নাটক নভেল লিখলে তাই হবে সাহিত্যের প্রগতি এ-কথাটা যে একেবারে utter nonsense—একটা অবিমিশ্র প্রলাপ-বাক্য সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহই নেই। আসলে এঁরা সামাজিক সহৃদয়তাকে, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক শুভবুদ্ধিকে সাহিত্যের ধর্ম-বলে' চালাতে চাচ্ছেন—কাবালক্ষীকে দিয়ে তাঁদের Augean stable আস্তাবল ঝেঁটিয়ে নিতে চাচ্ছেন। কিন্তু কাব্যলক্ষী যদি ও-কাজ করতে রাজিও হন তবে শেষাশেষি তাঁকে ভাঙা গলায় এই বলে' গান ধরে' দিতে হবে—

হরদম লাগাতা ঝাড়ু তব ভি এইসা হাল—

সে যা হোক্ উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে সর্বদেশে সর্বকালে কেউ কেউ চাপিয়ে থাকেন। সাহিত্য সম্পর্কে বর্তমানে এদেশে কামরেড্ মনোভাবাপন্ন কেউ কেউ তাই করেছেন—তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। গান্ধীজী যখন বলেন যে চরকার ঘর্ঘরই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত তখন আশ্চর্য হইনে কিম্বা বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক যিনি সর্বহারা সর্বহারা বলে' নাটকেপনা করতে পেলে আর কিছু চান না তিনি তখন বক্তৃতা দেন এই বলে' যে যে-সাহিত্যিকরা আজ এ-দেশে কেবল রসসৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত তাঁরা কাপুরুষ তখনও আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য হই তখন যখন দেখি যে বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে দু'একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ঐ দলে ভিড়ে গিয়েছেন।

আসলে মানব-জীবনে এমন দু'চারটি ব্যাপার আছে যার সম্পর্কে প্রগতি কথাটা ঠিক খাপ খাওয়ানো যায় না। সে-সব ব্যাপার যেন শুকদেবের মতো একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়েই জ্ঞানী। যেমন ধরা যাক্ সন্তানের জন্য মাতার স্নেহ। এ-স্নেহ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও যা ছিল এই বিংশ শতাব্দীতেও তাই আছে—বরং এই বিংশ শতাব্দীতে অতি সুসভ্য জননীদের অন্তরে যদি ও-বস্তু কিছু ফিকে হ'য়ে গিয়ে থাকে তবে সেটাকে মাতৃস্নেহের প্রগতি বলা চলবে না নিশ্চয়। সে যাহোক্ তাই মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে কোন প্রগতির আইডিয়া আমাদের মনে আসে না। ওটা গোড়া থেকেই পূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রকাশ হয়েছে। সুসভ্য মানুষের এমনি একটি ব্যাপার তার সাহিত্য, তার কাব্যরস।

বিজ্ঞানে প্রগতি আমরা বুঝি কেননা সেখানে মানুষ জ্ঞান থেকে জ্ঞানান্তরে, অসম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ জ্ঞানে যাচ্ছে—যা আজ জানে না, ধারণাও করতে পারে না তা কাল জান্‌ছে। কিন্তু নবরসে সিঞ্চিত সাহিত্য ব্যাপারে সে-রকম কোন পদ্ধতি নেই। সাহিত্য তার জন্ম থেকে অন্ততঃ বহু প্রাচীন কাল থেকেই তার পরিপূর্ণ ধর্ম নিয়ে প্রকট। কেবল সৃষ্টির কৃতিত্ব ও কৃতিত্বহীনতা দিয়ে আমরা বিচার করি কোন্‌টা সার্থক আর কোন্‌টা ব্যর্থ—কোন্‌টা উৎকৃষ্ট, কোন্‌টা নিকৃষ্ট। আমরা তাই সাহিত্য বিচার করে' বল্‌তে পারি—কোন্‌টা উত্তম কোন্‌টা মধ্যম কোন্‌টা অধম কিন্তু এ-কথা বল্‌তে পারি নে যে পঞ্চম শতাব্দী থেকে এসে দশম শতাব্দীতে সাহিত্য একটা মহাপ্রগতি লাভ করল কিম্বা এ-দাবী করতে পারিনে যে এই বিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা নগরীর কোন বস্তীর ড্রেন থেকে এক ডুব দিয়ে বঙ্গ কাব্যলক্ষী আজ দিব্যতর রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসবেন আমাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের সাম্‌নে। যাঁরা এইরকম কিছু ঘটবার আশা করেন তাঁদের চিন্তার জগত খুব স্পষ্ট বলে' মনে করবার কোন কারণ নেই। বরং সন্দেহ করবার কারণ আছে যে তাঁরা আসলে বাগ্দেবীর মন্দিরের পূজারী নন—তাঁরা আসলে হচ্ছেন রাজনৈতিক মল্লগৃহের উৎসাহী ভিড়।

প্রগতি বলতে একটা ক্রমবিবর্তন ব্যাপার, একটা evolutionary process বুঝি—যেমন জীবজগতে—ডারউইনের কথা যদি সত্যি হয়—মাছ ব্যাঙ্ পাখি হনুমান মানুষ এই রকমের একটা ক্রিয়া বুঝি। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে সে-রকম কিছু বলা চলে না। কেননা—আগেই বলেছি—সাহিত্যের পরিপূর্ণ ধর্মটি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে বিশ শতাব্দীতে নয়, তার বহু পূর্বে। এ-কথা যাঁরা প্রমাণ করতে চান যে শেকসপীয়ার থেকে হুইটম্যানে এসে সাহিত্য প্রগতি লাভ করেছে কিম্বা শেলী থেকে এজ্‌রা পাউণ্ডে এসে সাহিত্য কলালক্ষ্মী দিব্যতর মূর্তিতে প্রকটতা হয়েছেন তাঁদের কথা সীরিয়াস্‌লি নেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে' মনে করি নে। কেন না, সেটা বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের ঐ যে কথা যারা আজ সাহিত্যে রসসৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত তাঁরা কাপুরুষ এই কথার মতোই প্রলাপবাক্য। অবশ্য এই সব প্রলাপ বাক্যেরও মক্কেল এ-দেশে আছে। আর তার কারণ বোধ হয় এই যে আজ সারা পৃথিবী জুড়েই এক বিরাট ডামাডোল চল্‌ছে। সেই ডামাডোলের মধ্যে এ-দেশেও বেতালা বেসুরো বেখাপ্পা মাদল বাজাবার জন্যে কেউ কেউ উন্মুখ হয়ে উঠেছেন।

অবশ্য কারো এ-মত হ'তে পারে যে এজ্‌রা পাউণ্ড শেকসপীয়ারের চাইতে বড় কবি। কিন্তু তা সাহিত্যের প্রগতি বলে' কিছু ঘোষণা করবে না। তা কেবল ঘোষণা করবে এই যে এজ্‌রা পাউণ্ড শেকসপীয়ারের চাইতে একজন বড় প্রতিভা—সাহিত্যের ধর্মকে তার কলাকৌশলকে তার যাদু মন্ত্রকে তিনি আরও কৃতিত্বের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন।

অবশ্য কোন বিশেষ জাতির বিশেষ ভাষার সাহিত্যের ক্রমোন্নতি হতে পারে এবং হয়। কিন্তু সেটাকে সাহিত্যের প্রগতি বলা চলে না। কেননা সেই ভাষার সাহিত্যের উন্নতি সাহিত্যের যে পরিপূর্ণ ধর্মকে আমরা জানি সেই ধর্মের গণ্ডির মধ্যেই ঘট্‌বে, তা অতিক্রম করে' নয়। প্রতি শিশুটির একটা ক্রমোন্নতি ঘটে কিন্তু তাকে বিশ্বমানবের প্রগতি বলে' ভুল করা চলে না।

সে যা-হোক্, কামরেড্-জাতীয় মনিষীবৃন্দের (?) এই রকমের আরও প্রলাপবাক্য আমাদের কিছুদিন সহ্য করতে হবে বলে' মনে করি। কিন্তু তাতে আশঙ্কার কিছু নেই। কেননা প্রলাপ-বাক্য যে আসলে অপলাপ-বাক্য তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে বাধ্য। কেবল মুস্কিলের কথা এই যে ইতিমধ্যে আমাদের এই সব জ্ঞানীদের শ্রীমুখনিসৃত বহু মিথ্যা কথা এবং তজ্জন্য বিকৃত রুচিকে পাশ কাটিয়ে চলবার জন্যে সদা সতর্ক হ'য়ে থাকতে হবে।

তবে সাহিত্যে প্রগতি সম্বন্ধে একটা কথা অনুমান করতে পারা যায়। সেটা হচ্ছে এই যে সাহিত্যে সত্যিকারের প্রগতি ঘটতে পারে যদি সাহিত্যিক একটা উচ্চতর চেতনার স্তরে পৌঁছে কোন উচ্চতর দীপ্তি ও রস সাহিত্যে নামিয়ে এনে তাই উপযুক্ত কলা-কৌশলে পরিবেশন করতে পারেন—যার আস্বাদ বর্তমান বিশ্বমানব এ-পর্য্যন্ত পায় নি। কিন্তু এর সঙ্গে বস্তীর শ্রীমতী লখিয়ার কোন অনিবার্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। সে যাহোক এ-সম্বন্ধে বহু বাক্ বিস্তার করবার আমার অধিকার নেই। এবং কামরেড্-মার্কা সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের যে সে অধিকার আছে তাও মনে করি নে। ইতি

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

একটি কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

পৃথিবী প্রবীণ আরো হয়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে ;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
ও প্রাসাদে কারা থাকে?—কেউ নাই,—সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে
নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মত জাদুবলে।

সে আগুন জ্বলে' যায়—দহে নাক' কিছু।
সে আগুন জ্বলে' যায়
সে আগুন জ্বলে' যায়
সে আগুন জ্বলে' যায়—দহে নাক' কিছু।

নিমীল আগুনে ঐ আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মত।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যার নদীর জলে এক ভিড় হাঁস অই—একা ;
এখানে পেল না কিছু ;—করুণ পাখায়
তাই তারা চলে' যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'ল মুখ দেখা।

২

রাত্রির সঙ্কেতে নদী যত দূর ভেসে যায়—আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারো নৌকার বাতি জ্বলে ;
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে
সব কেরোসিন-অগ্নি ম'রে গেছে ; জলের ভিতরে আভা দ'হে যায়
মায়াবীর মত জাদুবলে।

পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূর ভূমিকার পর ;
সত্য সারাৎসার মূর্ত্তি সোনার বৃষের পরে ছুটে সারাদিন
হয়ে গেছে এখন পাথর ;
যে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জ'ন্মে পেয়েছিল কৌটিল্যের সংযম
তারাও ম'রেছে—আপামর।
যেন সব নিশিডাকে চলে' গেছে নগরীকে শূন্য করে' দিয়ে—
সব রাথ বাথরুমে ফেলে ;
গভীর নিসর্গ ক্রমে সাড়া দিয়ে প্রবাদের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিত
একটি মানুষ কাছে পেলে ;
যে মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যেই দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে
সম্রাটের সৈনিকেরা যে সব লবণ খাবে জেগে উঠে',
অমায়িক কুটুম্বিনী জানে ;—
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে
আঘাত করিবে কোনখানে ?
হয়তো নিসর্গ এসে একদিন বলে' দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।

দিন ও রাত্রির কবিতা

বিরাম মুখোপাধ্যায়

হ্যাঁ, আবার বলছি :
দিনের আলো তোমার জন্যে নয়,
দিনের আলোয় আমি তোমাকে অস্বীকার করি!
তোমার জন্যে রাতের ঘনীভূত অন্ধকার,
প্রাগৈতিহাসিক, জটিল অন্ধকার—
রাতের অন্ধকারে আমি তোমাকে অঙ্গীকার করি!
হ্যাঁ, আবার বলছি, দিনের আলো তোমার জন্যে নয়।

দিনের আলোয় আমি দাসত্ব করি সূর্য্যের,
সোনার উপাসনায় স্বর্ণকারের মতো
মগ্ন হ'য়ে থাকি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে ;
কী কঠিন উপাসনা!
শিরা-উপশিরার বন্দীরক্ত পরিণত হয় ঘামে,
আর সেই লবনাক্ত ঘাম
তপ্তার্ত্ত ঠোঁট দু'টিকে বিদ্রূপ করে।
তখন আমি আর এক মানুষ,
তখন আমি তোমার চোখে মৃত, বিকৃত,
বীভৎস যান্ত্রিক পরিণতি,
তখন আমি স্বর্ণমানের চুল-চেরা হিসেবে বিব্রত
অতিলোভী অন্ধ ভিক্ষুক।

আর রাতের অন্ধকারে
কে যেন আমার সে-অন্ধত্ব মুছে দিয়ে যায়,—
হিসেবী-বুদ্ধির সমস্ত শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
আত্মার রক্তিম লীলায় নিজেকে আমি নিঃশেষ করে' সমর্পণ করি ;
আর, সে-আত্মার রঙিন্ ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন হ'য়ে

কখনো লাঞ্ছিত হই,
কখনো বা কোটি-কোটি প্রত্যাশায় প্রসন্ন হ'য়ে উঠি,
কখনো বা অচরিতার্থ বাসনার দংশনে
আত্মহত্যার সংকল্প নিই,
কখনো বা ভূমার আনন্দে কামনা করি মৃত্যুর পরিপূর্ণতা।

রাত্রির অন্ধকারে আত্মার এই দৌরাত্ম্য,
আর ক্লান্ত হৃদয়ের সহস্র ধারালো প্রশ্ন,
আর রূপালী চাঁদের দার্শনিক আদর
আমাকে অভিভূত করে' রাখে ;
হৃদয়ের অচেতন গভীরে,
অন্ধকারের নিঃশব্দ গভীরে,
তখন সুধু তুমি,—সুধু তুমি।
বিশ্বাস করো, তখনো আমি অন্ধ,
তখনো আমার ভীরু ইন্দ্রিয় সুধু তোমার মুখাপেক্ষী,
তখনো বাসনার ছায়াপথ ধরে'
সুধু তোমার পিছু-পিছু হাঁটছি।

হ্যাঁ, আবার আমি বলছি :
দিনের উজ্জ্বল সোনালী আলো তোমার জন্যে নয়—
তোমার জন্যে রাতের ঘনিষ্ঠ অন্ধকার !
সুধু রাতের নিঃশব্দ অন্ধকারে
তুমি আমাকে জাদু করো,
তোমার ইন্দ্রিয়ের গোলকধাঁধায়
আমাকে নিষ্ঠুরভাবে অবরুদ্ধ করে' রাখো।

হ্যাঁ, সত্যি কথাই আমি বলবো :
চাঁদের চাইতে সূর্য্যই সহস্রাংশে শক্তিশালী।

তাই, তুমি প্রতীক্ষা করো রাত্রির,
আর দিনের প্রখর আলো আমাকে সন্ধান করে।

বিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ষ্টীমার ছেড়ে দিল।
ডেকে রেলিং ধরে' দাঁড়িয়ে আছি,
তুমি দাঁড়িয়ে আছ জেটিতে।

মেয়েরা বঁটিতে চাকা চাকা করে' থোড় কাটে,
সুতোয় সুতোয় চাক্তিগুলো যেন বাঁধা,
একটু সরালেই সূক্ষ্মতন্তুগুলি যায় দেখা,
আর একটু সরালেই পটপট করে' ছিঁড়ে যায়।

অল্প আগে ছিলে আমার ভুজ-বন্ধনে বাঁধা,
দেহ মনে জমাট অবিভিন।
পড়ল বিচ্ছেদের ছুরি মাঝখানে,
এক হ'ল দু'খানা।
এক টুক্‌রো তার রইল প'ড়ে তটে,
আর এক টুক্‌রো আস্তে আস্তে সরে' যায়
চলিষ্ণু ষ্টীমারের বৈড়ার উপকণ্ঠে।

সরু সরু সুতির ক্রমলম্বমান রেখা
যেন ওই ব্যবধানটুকুর সেতুবন্ধনী।
সহস্রধারায় প্রাণ ছুটে যায় প্রাণান্তরে
বসুধা প্রসারিত কৈশিক রেখার লক্ষ পথে।

ষ্টীমার ছুটল বেগে,
পট পট করে' ছিঁড়ে গেল সেই তন্তুগুলি।

ক্ষীণ হ'য়ে আসে তোমার অচল মূর্ত্তি
অপস্রিয়মান তটে,
কখন বিন্দু হ'য়ে মিশে গেলে
সেই শ্যামায়মান সৈকতে !

রইল অনুত্তীর্য্য দেশকাল দু'জনার মাঝখানে।
কোনো পারাপার নেই কি এই অকূলে ?
এই জীবনে সীমাটুকুই সত্য ?
মর্ম্মভেদী অস্বীকারে শুধু অসীমের পরিচয় ?
নাস্তিত্বের নিষ্পরিধির অন্তস্তলে
তুমি শুধু চিরন্তন সত্যের নিশ্চিহ্ন কেন্দ্রবিন্দু ?

লের্‌শের একটী কবিতা

হুমায়ুন কবির

দেখিলাম মৃতদেহ আমাদের পরিখার পারে।
বহুক্ষণ পূর্ব্বে তার জীবন হয়েছে অবসান।
সূর্য্যালোকে শিরস্ত্রাণ ঝলসি উঠিছে বারে বারে!
নিশির আঁধারে দেহ হিমবায়ে শীতল পাষাণ।
সারাদিন একমনে হেরিলাম মুখে তার চাহি,
নিশ্চিত জানিনু মনে সে আমার আপনার ভাই।
সুদীর্ঘ প্রহর কাটে। শতকণ্ঠে শান্তি গীত গাহি
সহসা উঠিল যবে, তার কণ্ঠ শুনিবারে চাই।

নিশীথ স্বপনমাঝে কার স্বর বাজিল শ্রবণে ?
কে আসি কাঁদিয়া কহে, "তুমিও ভুলিলে মোরে ভাই ?"
নিদ্রা টুটি আচম্বিতে বাহিরে আসিনু তার কাছে,
অপরিচিতের লাগি রচিলাম সমাধি যতনে।
এ চোখের ভুল শুধু—চিত্ত মোর ভুল করে নাই,
প্রতি শবদেহে ভ্রাতৃ-মুখছবি আঁকা রহিয়াছে।

ঝড়ের আকাশ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

শেষরাত্রে জানালাটা বোধ হয় খোলাই ছিল। আকাশের তারাগুলো আরও স্বচ্ছ, আরও পরিষ্কার বলে' মনে হচ্ছে। রাশীকৃত এলোমেলো চিন্তা নিয়ে কৃষ্ণা এপাশ-ওপাশ করেছে কতবার! ঘরের মধ্যে পরিক্রমণ করতে করতে এক-একবার সে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হ'তে চেষ্টা করেছে। তখন তার চোখে বিদ্রোহের আগুন—সমস্ত ভেঙে চুরমার করবার একটা দুর্ব্বার আকাঙ্খা; আবার হয়ত একটু পরেই অন্ধ হতাশায় ম্লান জড়ত্বুপের মত পড়ে' আছে। ভিতরে উত্তাপ নেই—ঝড়ের আঘাতে ছিন্ন বনস্পতির মত সর্ব্বহারা। দুর্ব্বলতায় কৃষ্ণাকে আরও করুণ, আরও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কোনদিকে যেন পথ নেই, নিরন্ধ্র অন্ধকারে নীড়হারা পাখির মত একটু আলো দেখবার জন্য যেন ছটফট করছে।

পূবদিকটা একটু লাল হ'য়ে এসেছে। অস্বস্তিতে সে বিছানায় উঠে বস্‌লো—এখুনি হয়ত জয়ন্ত এসে পড়বে। কালকেই চিঠিটা পাবার কথা, চিঠি পেলে এক মুহূর্ত্ত সে দেরী করবে না। কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে সাড়ীগুলো নামালে। জিনিষপত্র কিছুই গুছিয়ে নেওয়া হয়নি। চারিদিকে সব বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে' আছে। রমলার কাছে একটা সাড়ী আর ব্লাউজের কিছু কাপড় ছিল—এত ভোরে তারু হয়ত ঘুম ভাঙেনি। আর কীই বা এমন জিনিষ! ফিরিয়ে নিতে কৃষ্ণা কি রকম যেন সঙ্কোচ বোধ করলে। উপহার নয়—তবু একটা চিহ্ন!

রমলার কথা ভাবতে গিয়ে কৃষ্ণার দু'চোখ ভ'রে জল এলো। এক হাতে চোখটা মুছে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। বাইরে বৃষ্টির ছাট তার চোখে মুখে এসে লাগছে, তবু সে দু'চোখ মেলে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছে। হয়ত কিছুই দেখছে না।

এ বাড়ীতে যে ক'টা দিন কেটেছে তার প্রত্যেকটি দিনের ঘটনা সে মনে মনে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিল। হেমলতার স্নেহের অত্যাচারে প্রতিদিন সে পীড়িত হ'য়েছে কিন্তু এমন চরম দুর্ঘটনা সে কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ তার মনে হ'লে হাসি পায়, গত রাত্রে এই ভদ্রমহিলাটি নিজের হাতে তার জন্যে খাবার সাজিয়ে রেখে গেছেন—বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বেশী রাত হ'লে সব নষ্ট হয়ে যাবে! আশ্রিতজনের প্রতি অযাচিত করুণা, না গৃহস্বামীর অকল্যাণের আশঙ্কা তাঁকে বিচলিত করেছিল বলা যায়না। অভুক্ত খাবারের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় কৃষ্ণার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠ্‌লো।

অনেক প্রয়োজনে মানুষ ডাইবিন্ থেকেও খাদ্য তুলে খায়, আর অনেক প্রয়োজনে সে—না তা কিছুতেই নয়, কৃষ্ণা তা পারেনা।...

সেদিন কৃষ্ণা একটু আগেই কলেজ থেকে এসেছে। কাপড় তখনও বদলায় নি, আরতি এসে দাঁড়াল, 'মা ডাক্‌ছেন তোমায়।'

শঙ্কিত মনে কৃষ্ণা হেমলতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'Florence থেকে তোমার নামে অশোক-এর একটা চিঠি আর একটা পার্শেল এসেছে—' হেমলতা গম্ভীর গলায় বল্‌লেন।

কৃষ্ণা অতিমাত্রায় বিস্মিত হ'য়েছিল। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্কোচও এসেছিল অনেকখানি; দুর্বল কণ্ঠে কোনরকমে বল্‌লে, 'আমি ত কিছু জানিনা মাসিমা—'

'হুঁ'—হেমলতা মুখখানা আরও গম্ভীর করে' তুললেন। কৃষ্ণা চলে' যাচ্ছিল—আরতি তার হাতে চিঠি আর প্যাকেটটা দিতে যেতেই হেমলতা তীব্র কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করে' উঠ্‌লেন, 'খবরদার আরতি, ওসব ছুঁয়োনা তুমি।' তারপর আপন মনেই বলে' গেলেন, 'জানেন না, কচি খুকি! তবু যদি না আমার চোখে পড়্‌তো! আমার বাড়ীতে বসে' এসব বেহায়াপনা চল্‌বে না—তাও বলে' দিচ্ছি।' যাকে উদ্দেশ করে' বলা হ'লো, কথাটা কানে নেবার শক্তিটুকুও তার তখন ছিলনা। দুঃসহ অপমানে, লজ্জায় কৃষ্ণা একেবারে ভেঙে পড়্‌লো। সমস্ত শরীর তার হিম হ'য়ে আস্‌ছে।

কৃষ্ণার আচরণে কোন ত্রুটি ছিলনা। হেমলতার প্রকৃতি সে ভাল ক'রেই জান্‌তো। আর ভয়ে ভয়ে তাই সে নিজেকে লুকিয়ে রাখ্‌তো। কোনদিন অশোকের সামনে বের হয়নি—কোনদিনই হয়ত তাদের দেখা হ'তোনা, শুধু একদিন—কিন্তু সে দোষ কি কৃষ্ণার?

বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যার শেষ রশ্মি। দিবসের ক্লান্তি শেষ হ'য়ে এসেছে। কৃষ্ণা সেলাইয়ের কলের ওপরে ঝুঁকে মেসিনের দ্রুতগতিকে শাসন করছিল। ক্লান্তি তার কিছুতেই আসেনা। রাশীকৃত নানা রঙের কাপড় একটির-পর-একটি সূচের মুখে রেখে সে দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছে।

পিঠের শির-দাঁড়াটা বেঁকে ঝুমড়ে গেছে। বসবার ভঙ্গীতে শিথিল ক্লান্তি। তবু সে এসব ফেলে উঠ্‌তে পারছে না—একটানা কল চালিয়ে দুর্বল স্নায়ুগুলোকে সহজ করে' নেবার চেষ্টায় এক-একবার সে উঠে দাঁড়াচ্ছে। নিরুপায় দেহটা একটি নিশ্চিন্ত অবসরের আশায় উন্মুখ হ'য়ে ছিল। কখন এগুলো শেষ হবে আর সে পাবে বন্ধন থেকে মুক্তি—একটা নিশ্চিত আরামের সুখস্বপ্নে কৃষ্ণার কাজের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

'সুইচটা টেনে দিতেও কষ্ট হয়, কি বলো!'—লঘু পদক্ষেপে রমলা ঘরে ঢুকলো। আলোটা জেলে দিতেই ঘরের অন্ধকার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো। কৃষ্ণা এক মুহূর্ত্ত সচকিত হ'য়ে চোখ তুলে তাকালো, তারপর আবার কাজে মন দিলে। রমলাকে দেখে সে যে খুব খুশী হ'য়েছে তা মনে হ'লনা—রমলা সেটা লক্ষ্য না করে' কাছে বসে' বল্‌লে, 'শেষ পর্য্যন্ত আমি আশা ক'রেছিলাম, তুমি যাবে।' কৃষ্ণা একবার যেন একটু অন্যমনস্ক হলো, পরে মেসিনটা ঘোরাতে ঘোরাতে বল্‌লে, 'না যেতে পেরে সত্যি আমি দুঃখিত হয়েছি রমলা।'

'না, আমি জানি তুমি ইচ্ছে করে' যাওনি এবং না যেতে পেরে বরং সুখীই হয়েছ। একজনকে অপমান করলে সে অপমান নিজের গায়েও এসে লাগে—এ সাধারণ কথাটাও যে তোমাকে নতুন করে' শোনাতে হবে, সত্যি, এ আমি আশা করিনি।' রমলা একটু উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিল। কৃষ্ণা কিন্তু এ কথার উত্তর দিলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বল্‌লে, 'এখন কি করতে হবে?'

'আগে তোমায় বল্‌তে হবে নিজের হাতে সব প্রোগ্রাম তৈরী করে' কেন তুমি সরে' পড়লে? পিক্‌নিকের আইডিয়াটা ত আমাদের মাথায় আসেনি! নাই বা হ'তো পিক্‌নিক্!'

'সুটীমারে ত অনেকেই গিয়েছিল শুন্‌লাম।' কৃষ্ণা একটু গম্ভীর গলায় বল্‌লে।

'এ সব জান্‌লে, সত্যি বল্‌ছি কৃষ্ণাদি, কেউ আমাকে এর মধ্যে জড়াতে পারতো না। কী মুস্কিলে যে পড়েছিলাম—সমস্ত তাল একা আমাকে সাম্‌লাতে হয়েছে। অতিথি-অভ্যর্থনা থেকে মায়ের দোক্তার কৌটো পর্য্যন্ত সব-কিছুর উপর নজর রাখা—ভাব্‌তে পারো? ফিরেছি ত রাত দু'টোয়।'

'আমি তা জানি।' কৃষ্ণা বল্‌লে।

'কিন্তু তুমি কেন গেলে না বলো ত?'

কৃষ্ণা চুপ করে' গেল। রমলা অন্যমনস্কভাবে সেলাইগুলো নাড়াচাড়া করছিল। অনেকগুলো মুহূর্ত্ত কেটে গেল। কেউই কোন কথা বল্‌লে না। যে মুহূর্ত্তগুলো অজস্র কথায় ভরে' উঠ্‌তে পারতো, ওরা তা সময়ের সমুদ্রে নিশ্চিহ্ন হ'তে দিলে কোন কথা না বলে'। একটু পরে রমলা বল্‌লে, 'অশোকদা কালকেই চলে' যাবে, তুমি বোধ হয় জানো—'

'না জান্‌লেও জেনে নেবো।' কৃষ্ণা বল্‌লে।

'জেনে নেবে কি, আমিই ত তোমায় বললাম।'

'বেশ, তবে ত জানাই হ'য়ে গেল।' কৃষ্ণা ব্লাউজের গলাটায় ফ্রিল লাগাতে লাগাতে বল্‌লে।

'তুমি অদ্ভুত কৃষ্ণাদি! আমাদের কাছে যা সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ, তোমার কাছে এক মুহূর্ত্তে তা তুচ্ছ হ'য়ে যায়। অথচ তুমি যা নিয়ে তোমার বহুমূল্য সময় ব্যয় করো আমরাও তার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। অন্যের উপেক্ষাকে ক্ষমা করবার ধৈর্য্য তোমার অপরিসীম। কিছুতেই যেন তোমার কিছু আসে যায় না। আঘাত পেলেও ফিরে দিতে চাইবে না—এ তোমার কী অদ্ভুত স্বভাব!' রমলা কথাগুলো বল্‌তে পেরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস টান্‌লে।

কৃষ্ণা কোন উত্তর দিলে না। শুধু কাপড় দুটো জোড়া দেবার সময় বললে, 'কাপড়টা একটু টেনে ধরবি? একা বড় অসুবিধে।' রমলা সেদিকে কান না দিয়ে বল্‌লে, 'তুমি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছো না?'

'শুন্‌ছি ত।' শান্ত কণ্ঠে কৃষ্ণা বল্‌লে।

'তুমি দিন দিন এত সিরিয়াস হচ্ছো!' রমলা এবার সত্যি সত্যি চুপ করে' গেল।

কৃষ্ণার হাতের কাজও বোধ হয় এতক্ষণে শেষ হলো। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ক্লান্ত দেহটা বিছানার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'কি বল্‌বি?'

রমলার যেন অনেক কথা বল্‌বার ছিল—এমনি মুখের ভাণ করে' বল্‌লে, 'তোমাকে আর কোন কথা বল্‌তে সাহস হয় না কৃষ্ণাদি।'

'তুই আমাকে কি ভেবেছিস্ বল্‌তো?' উচ্ছ্বসিতভাবে কৃষ্ণা রমলাকে বুকের কাছে টেনে নিলে।

আকাশে দু'একটা তারা দেখা যাচ্ছে। এলোমেলো বাতাসে জানালার সার্শী ক'খানা মাঝে মাঝে নড়ে' উঠ্‌ছে।' এই মুহূর্ত্তে রমলা যেন অনেক শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে—এমনি দুর্বল কণ্ঠে বল্‌লে, 'কোন কিছু করতে ভাল লাগে না, কেমন যেন boaring লাগে সব সময়।'

অনেকক্ষণ তারা চুপ করে' রইলো। তাদের কথা যেন ফুরিয়ে গেছে, কিম্বা কথা বল্‌তে যেটুকু উৎসাহ এবং উত্তাপ দরকার তাও যেন তাদের নেই। কৃষ্ণা বালিসের ওপর ভর দিয়ে রমলার চুলগুলো

ঠিক করতে লাগলো। রমলা বল্‌লে, 'না ভাই, ছাড়ো কৃষ্ণাদি! লগেজগুলো মিলিয়ে আবার একটা লিষ্ট করতে হবে। অশোকদা হোটেল থেকে অনেক রাত করে' ফিরবে। সে এলে তার জিনিষ তাকেই গুছিয়ে নিতে বল্‌তাম।' 'কথাটায় একটা ইঙ্গিত চাপা ছিল, সেটা বুঝতে পেরে কৃষ্ণা বললে, 'বেশ ত আমি তোকে সাহায্য করছি।'

'কি করে' বলি, শেষে যদি আবার কিছু মনে হয় তোমার!' যেতে যেতে রমলা বললে, 'অশোকদা বলছিল—'

কোন কিছুতেই কৃষ্ণার কৌতূহল নেই। তেমনি আগ্রহশূন্য শান্ত দৃষ্টি। রমলা নিজেই বলে' যেতে লাগলো, 'থাক্ গে, আমার সে কথায় কি দরকার, কি বলো?'

কৃষ্ণা তেমনি সহজ কণ্ঠে বললে, 'আমি ত কিছু প্রশ্ন করিনি।'

'কোন কিছুতেই ত তুমি প্রশ্ন করো না।' রমলা একটু খোঁচা দিলে। কৃষ্ণা তার ঘরের কাছে থেমে পড়ে' বল্‌লে, 'তুই যা, আমি একটু পরে আসছি।'

রমলা একবার তার দিকে ফিরে তাকাল, তারপর কোন কথা না বলে' পাশের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

দক্ষিণ দিকের ঘরে—বিছানায় হেমলতা যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ করছেন, পায়ের কাছে বসে' আরতি; বোতলে করে' মিকিকে দুধ খাওয়াতে ব্যস্ত। দ্বিধাগ্রস্ত ভীরু মন নিয়ে কৃষ্ণা ঘরে ঢুকলো। হেমলতা একবার চোখ তুলে তাকিয়ে পাশ ফিরলেন। আরতি বললে, 'ওষুধটা দিয়ে গেলে না কৃষ্ণাদি! সেই থেকে মাথার যন্ত্রণায় মা অস্থির হ'য়ে পড়েছেন।'

কৃষ্ণা অপরাধীর মত চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে বললে, ভুল হ'য়ে গেছে মাসিমা।'

হেমলতা রুদ্ধ গলায় বললেন, 'এরকম ভুল যেন আর না হয়!' কৃষ্ণা ভয়ে ভয়ে বললে, 'আমি ঠিক সময়েই আসতাম্ মাসিমা, শুধু সেই সেলাইগুলো—'

'এখনও হয় নি বুঝি?'

'সব হ'য়ে গেছে—সেই জন্যই ত দেরী হলো। শুধু মিকির ছুটো জামা হয়ে উঠলো না।' আলমারি থেকে শিশিটা বের করে' সে হেমলতার মাথার কাছে সরে' এলো। আরতি দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে' বললে, 'মিকির হ'লোনা কেন? ওরটা আগে করতে পারোনি? দেখছো এই বর্ষায় কি রকম কষ্ট পাচ্ছে!'

কৃষ্ণা আরতির কথায় একটু হেসে বললে, 'কালই শেষ হ'য়ে যাবে।' আরতি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল, মিকি এমন উপদ্রব করলে, দুধের বোতল মাটিতে পড়ে' টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল। হেমলতা সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে একেবারে উঠে বসলেন; কাঁচের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবার কিনতে হ'বে ত একটা, আমি এখুনি ও আপদকে দূর করে' দিচ্ছি।'

'তুমি ত ওকে দেখতেই পারোনা মা। আমি টিফিনের পয়সা জমিয়ে সব করি—তাও তোমার সয় না।' মার্জ্জার-শিশু মিকিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে একরকম অভিমান করেই আরতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণা একমনে হেমলতার মাথায় তেল মালিশ করছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে চোখ দু'টো তার বুজে আসছে। হেমলতা হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বসে' বসে' আর ঘুমুতে হবে না'। কৃষ্ণা একেবারে সজাগ

হ'য়ে চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে বললে, 'না মাসিমা ঘুমুইনি।'···হেমলতা শরীরটা নাড়া দিয়ে একটা অস্বস্তিকর শব্দ করে' বললেন, 'পা দু'টো আবার কামড়াচ্ছে, কে জানে আজ হয়ত একাদশীই হবে।' কৃষ্ণা মাথা ছেড়ে পায়ের কাছে উঠে এলো।

রাত হয়ত একটু বেশীই হবে। কৃষ্ণা শূন্য দৃষ্টি মেলে স্থাণুর মত বসেছিল। নিঃস্পন্দ, অসাড় রাত্রি। ট্রাফিকের কর্কশ শব্দ অন্ধকারের অতলে ঢাকা পড়েছে। মাঝে মাঝে রিক্সর একটানা সুরে সহরের বাতাস রোমাঞ্চিত। একটু আগে কৃষ্ণার দেহ ঘুমে ভরে' আসছিল, কিন্তু এখন?

নীচের ঘরে এখনও আলো জলছে। কৃষ্ণা একটু ইতস্ততঃ করছিল, তারপর কি মনে করে' নেমে এলো।

অতিরিক্ত ব্যস্ততার সঙ্গে রমলা ট্রাউজারগুলো মিলিয়ে রাখছে—কৃষ্ণাকে দেখে মুখটা একটু গম্ভীর করে' বললে, 'তুমি এখনও শুতে যাওনি?' প্রশ্নটা অর্থহীন। কৃষ্ণা পাশে বসে' রমলার সাহায্য করতে লাগলো।

একটু বাদে কৃষ্ণা বললে, 'রাত এখন কত?'

'কি জানি?' একটু থেমে তারপর রমলা বল্‌লে, 'টাইগুলো আর একবার iron করতে পারলে হ'তো···টুইড্ কোটটা বাইরে থাক্, কি বলো?'

কৃষ্ণা কর্ম্মতৎপর বোনটির কার্য্যকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে বললে, 'তুই এত সব জানিস্ রমলা, বয়সে ছোট হ'লেও তোর কাছে শিখে নিতে লজ্জা নেই।'

রমলা অনেকক্ষণ পরে এইবার একটু উঠে দাঁড়াল। ড্রয়ারটা বন্ধ করে' বললে, 'এ সব অশোকদা'র মায়ের কাছে শেখা কৃষ্ণাদি, এলাহাবাদে অনেকদিন তাঁর কাছেই ছিলাম যে। টাইফয়েডে ভুগে সেবার শরীরে আর কিছু ছিল না। জ্যেঠিমা অনেকদিন পরে গ্রামের বাড়ীতে এসেছিলেন। আমাকে এত ভালবাসতেন—রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও যে এমনি করে' বুকের কাছে টেনে নেওয়া যায়—জ্যেঠিমাকে না দেখলে কোনদিন বোধ হয় ভাবতেও পারতাম না—'রমলা চোখে জল সম্বরণ করার চেষ্টা করে' বললে, 'কোন কথাই শুনলেন না, একরকম জোর করেই নিয়ে গেলেন। যাবার সময় শুধু নাকে বললেন—এখানে থাকলে ও কিছুতেই বাঁচবেনা বৌ।···কত জায়গায় না ঘুরে বেড়িয়েছি। তারপর···'

'তারপর?' হঠাৎ দু'জনায় তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনে চম্‌কে উঠ্‌লো—পিছন ফিরে দেখ্‌লে, অশোক ওভার-কোটটা খুল্‌তে খুল্‌তে অশোক বল্‌লে, 'তারপর চুপ করলে কেন?'

রমলা একটু হেসে বল্‌লে, 'তারপর তোমার কথা আরম্ভ কর্‌লে আজকের রাত্তিরেও শেষ হবে না। তার চেয়ে একটু ওভালটিন করে' আনি।'

অশোক বল্‌লে, 'এত বেশী আরামের প্রশ্রয় দিয়ে ভবিষ্যতের কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিচ্ছ। তার চেয়ে তুমি চুপ করে' বলো রমলা।'

রমলা বল্‌লে, 'কতক্ষণ আর! আমি আসছি এখুনি।'

কৃষ্ণা বল্‌লে, 'তুই থাক্ রমলা, আমিই যাচ্ছি।'

'তুমি পারবে না কৃষ্ণাদি, আমি না গেলে হবে না।' আর কোন কথা না বলে' রমলা চলে' গেল।

দু'জনেই নীরব। হয়ত তাদের কথা বলার কিছু নেই। কিন্তু এই শুব্ধ রাত্রে দুটী প্রাণীর চুপ করে' বসে' থাকাটা যে আরও বিশ্রী সেটা স্মরণ করে' দু'জনেই কথা বলার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো; কিন্তু কি-করে'

যে আরম্ভ করা যায়! সুন্দর কতগুলো কথা মনের মধ্যে সাজিয়ে দু'জনেই নাড়াচাড়া করতে লাগ্‌লো—সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে কেউই আরম্ভ করতে পার্‌লে না। এতক্ষণে অশোক বোধ হয় একটা কথা খুঁজে পেল, একটু সঙ্কুচিতভাবে বল্‌লে, 'আপনিও কষ্ট করে' জেগে বসে' আছেন?'

'কষ্ট হ'লে নিশ্চই থাক্‌তুম না। রমলা একাই এতক্ষণ এসব করছিল।' আবার কিছুক্ষণের জন্য দু'জনেই চুপ। অশোক বল্‌লে, 'সেদিন party'তে আমরা খুব enjoy করেছি, শেষপর্য্যন্ত আমরা আপনার আশা ছাড়িনি।'

এ কথার উত্তরে কৃষ্ণা কী বা বল্‌তে পারে!

রমলা ঘরে ঢুকে ফ্যানটা বন্ধ করে' দিয়ে বল্‌লে, 'যেটুকু গরম ছিল, আন্‌তে গিয়ে জুড়িয়ে গেল।' কাপে চুমুক দিয়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস টেনে অশোক বল্‌লে, 'এখন বুঝতে পারছি এ জিনিষটার যেন প্রয়োজন ছিল।'

'তবু আর একজনের বলে' দিতে হ'লো।'···রমলার চোখের কোণে হাসি লুকিয়ে ছিল। অশোক তার কথার উত্তরে বল্‌লে, 'তাতে দুঃখ নেই রমলা—যেদিন বুঝবো আমার কোন-কিছু নিয়ে ভাববার প্রয়োজন সকলের ফুরিয়ে গেছে সেদিন সামান্য আরামের ক্রটিটাই আমার কাছে বড় হবে না জেনো।'

'ইউরোপের আবহাওয়ায় এই নাবালক শিশুটি যে কি রকম নাকাল হবে, আমি শুধু সেই কথাটাই ভাবছি—বললাম অশোকদা সঙ্গে নাও!'

'তার মানে তুমি আরও নাকাল হ'তে বলছো!'

'তা বই কি! একদিন দেখো আমি একাই চলে' গেছি। হয়ত ভিয়েনার কোন রেস্তোরাঁয় আমাদের দেখা হ'লো—যেখানে শুধু নিরামিষ ভোজের আয়োজন। অনেক খুঁজে খুঁজে ভাত খাবার লোভে তুমিও হয়ত সেখানে গিয়ে হাজির হ'বে। আমাকে দেখে বললে, কতদিন আলু সিদ্ধ আর ভাত খাইনি রমলা, কত কষ্ট করে' যে এই রেস্তোরাঁকে আবিষ্কার করেছি!···তোমাকে দেখে আমার একটু দয়া হ'লো, বললাম, আমার ওখানে একদিন যেও, খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াবো।' রমলার কথা বলার ভঙ্গী দেখে কৃষ্ণাও অশোক দু'জনেই প্রবল হেসে উঠ্‌লো; কিন্তু পরক্ষণেই সকলে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

হেমলতা ঘরে ঢুকে কটাক্ষ করে' বল্‌লেন, 'কৃষ্ণা ঘুমে যে একেবারে এলিয়ে পড়েছিলে! আজকালকার মেয়ে তোমরা কত রকমই জানো!···'

হেমলতা চলে' যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হিম শীতল স্পর্শ সকলকে আচ্ছন্ন করে' রাখলে কিছুক্ষণ। কেউ কোন কথা বল্‌লে না। বাতাসে শীতের ধার। জড়ন্তূপের মত বোবা দৃষ্টি মেলে কৃষ্ণা বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো।

ঘটনাটা কিছুই নয়। কিন্তু Florence থেকে অশোকের চিঠি আসার পর হেমলতা একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করলেন। কৃষ্ণা কিন্তু এতে একটুও বিস্মিত হ'লো না। এ রকম যে একটা ঘট্‌বে সে যেন আগে থেকেই জান্‌তো—শুধু একটা climax-এর অপেক্ষা।

এ বাড়ীর আবহাওয়া অক্টোপাসের মত যেন তার সমস্ত শরীরকে আঁকড়ে ধরেছে। আর নয়—আর নয়। কৃষ্ণা একটু উন্মুক্ত আকাশ দেখতে চায়। প্রাত্যহিক নিয়মানুবর্ত্তিতার যান্ত্রিক নিষ্পেষণে সে বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত। সমস্ত মন দিয়ে সে চায় একটু নীল আকাশ, উদার সূর্য্যালোক। মানুষের নীচ মনের সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু যেন তার মধ্যে প্রবেশ না করে। সে বাঁচতে চায়। জীবনকে সুন্দর করে' গড়ে' তুলতে চায়। অস্থিরভাবে পদচারণা করতে করতে তার মন আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লো: কেন সে প্রতিবাদ করলে না! একটা অন্যায় সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ে কেন সে তার চলে' যাওয়ার স্মৃতিকে কলঙ্কিত করে' তুললে। একটু পরেই আবার সে দমে' গেল। কি হবে! কি হয়! কেউ কি কখনো কালোকে সাদা করতে পেরেছে?···ট্রাফিকের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে। কলকাতায় এখন রাত কত? সকাল হ'তে আর কত দেরী! দেয়ালের ঘড়ির সঙ্গে যেন সে হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামা মিলিয়ে দেখছে—এমনি অপলক দৃষ্টিতে সে কাঁটা দু'টোর দিকে চেয়ে রইলো।

ভোর হ'লেই জয়ন্ত আসবে। কিন্তু তারপর?

তারপর কৃষ্ণা আর কিছু ভাবতে পারে না। তারপর একটা কিছু হবেই। আগে জয়ন্ত আসুক!

সমস্ত রাতে কতবার যে সে বারান্দায় এলো আর ঘরে গেল—সে জান্‌তো ঘুম আজ আর তার আসবে না। একটু ঘুম, কিছুক্ষণের জন্য একটু বিস্মৃতি। কৃষ্ণা চেষ্টা করলে কতবার, চোখ বুজে সে স্থির করলে, কিছু আর সে ভাববে না। কিছু নয়, শুধু ফাঁকা—শুধু শূন্য—জাগরণের পট-ভূমিকায় একটা বিস্মৃতি আসুক; অবচেতনার মধ্যে সে তলিয়ে যেতে চায়—তার সমস্ত সত্ত্বা, সমস্ত অনুভূতি। কিন্তু সে জানতো ঘুম আর আজ আসবেনা।

অসহ্য গ্লানির বোঝা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। সেই কখন থেকে রাস্তায় জল দেওয়ার আড়ম্বর চল্‌ছে—এতক্ষণে শেষ হ'লো। কর্ম্মব্যস্ত সহর আবার জেগে উঠ্‌লো—আবার সহরের ট্রাফিক আরম্ভ হ'লো। আর একটি ধূসর দিনের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান কৃষ্ণাকেই এতক্ষণে কর্‌তে হ'তো। এ বাড়ীর প্রত্যেকটি প্রাণী উন্মুখ আগ্রহে যেন তার দিকেই চেয়ে আছে—কতক্ষণে কৃষ্ণা এসে ঘুম ভাঙাবে—তার সুনিপুণ হাতের নিখুঁত পরিচর্য্যা সকাল থেকেই সুরু হ'তো। এ বাড়ীর প্রত্যেক জিনিষটির উপর এখনও তার স্পর্শ লেগে আছে—কাল পর্য্যন্ত সে এ বাড়ীর একজন ছিল।

অন্যমনস্কভাবে সে ছাদের দিকে এলো—তার চলে' যাওয়ার স্মৃতি যেন কোনরকমেই করুণ হয়ে না ওঠে! মনের একটা নিশ্চিন্ত প্রফুল্লভাব, সতেজ দৃঢ় ভঙ্গী প্রাণপণে ফিরে পাওয়ার সে চেষ্টা কর্‌ছিল।

ছাদের কোণে রমলাকে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে কৃষ্ণা বিস্মিত হ'লো—এত ভোরে সে তো কোনদিন ওঠে না। সে যেন একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল—তারপর নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে' অন্যদিকে চেয়ে রইলো। রমলা পিছনের দিকে সরে' এসে পিঠের উপর একটা হাত রেখে ডাক্‌লে, 'কৃষ্ণাদি'!

কৃষ্ণা চোখ তুলে একবার তাকাল। রমলা বল্‌লে, 'একদিন যে তুমি চলে' যাবে এ আমি জান্‌তাম।'

'আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি রমলা।' কৃষ্ণা সনিঃশ্বাসে বল্‌লে।

'সত্যি কি তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারো?' আবেগে কৃষ্ণাকে জড়িয়ে ধরে' রমলা বল্‌লে, 'তোমার যাওয়া হবেনা কৃষ্ণাদি। কিছুতেই তোমায় যেতে দেব না!'

'তা হয় না রমলা।' কৃষ্ণাকে অসম্ভব রকম গম্ভীর দেখে রমলা নিরাশ হ'লো। তবু তার মন কিছুতেই এ কথা মেনে নিতে পারছিলনা; বিষণ্ণ চোখ কান্নায় করুণ হ'য়ে এলো। অভিমানে সে চোখ ফেরালে। বিক্ষুব্ধ চিত্তের অশান্ত অস্থিরতায় কাতর রমলা কোন কথা না বলে' নীচে নেমে এলো।

প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত উন্মুখ প্রতীক্ষায় চঞ্চল। কৃষ্ণার কোন দিকে খেয়াল ছিলনা। একাগ্র দৃষ্টি মেলে সে রাস্তার দিকে চেয়েছিল। সুট-পরা একটি ছেলে গেটে ঢুকতেই সে দ্রুতগতিতে সিঁড়ি পার হ'য়ে দোতালায় এলো।

যাক, সে বেঁচে গেছে। এতক্ষণে সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলো।

এদিকে আরতি চা হয়নি বলে' চীৎকার সুরু করে' দিয়েছে। হেমলতা কলতলা থেকে কি যেন একটা উত্তর করলেন, পরিষ্কার বোঝা গেল না।

জয়ন্ত বল্‌লে, 'রাত্তির ঘড়িতে এলাম' দিয়ে রেখেছিলাম—এমন মুস্কিল, উঠতে উঠতেই এত দেরী হ'য়ে গেল।' আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে আদেশের অপেক্ষা না করে' জয়ন্ত একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে এলো।

হেমলতা আড়ালে থেকে সমস্ত লক্ষ্য করছিলেন। এতটুকু মেয়ে, ক'দিনই বা এখানে এসেছে! তার নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা দেখে তিনি রীতিমতো বিস্মিত হলেন; গম্ভীর গলায় ডাক্‌লেন, 'কৃষ্ণা!'

কৃষ্ণা কাছে এসে প্রণাম করে' বল্‌লে, 'তোমার কাছে বলা হয়নি মাসিমা, আমি আজই চলে যাচ্ছি।'

হেমলতা জয়ন্তের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন; তারপর বল্‌লেন, 'না বলে' ভালই করেছ। কিন্তু কোথায় যাওয়া হবে এখন?'

কৃষ্ণা দীপ্তকণ্ঠে বেশ সহজ ভাবেই বল্‌লে, 'তা এখনও কিছু ঠিক করিনি। রাস্তায় ভাব্‌বার একটু সময় পাবো।'

হেমলতার মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বের হ'লোনা। তিনি এত বেশী বিস্মিত হয়েছিলেন যে সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে ছবির মত মনে হচ্ছিল। যাকে চিরদিন করুণার চোখে দেখে এসেছেন তার এই নির্ভীক কণ্ঠস্বর তাঁর মর্য্যাদাবোধকে সচেতন করে' তুল্‌লে।

কৃষ্ণা তেমনি হাসিমুখে বল্‌লে, 'কতদিন কত দোষ করেছি মাসিমা, ক্ষমা চাইবার সাহস নেই আমার!'

রমলার হাত ধরে' সে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। হেমলতা রুক্ষ গলায় বল্‌লেন, 'আরতি, ঘরটা ভাল করে' দেখে আয়।' কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে' বল্‌লেন, 'সেলাইগুলো সব সুটকেশে রেখেছ ত?'

'ওগুলো আলমারিতে যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। আমি রমলাকে সব দেখিয়ে দিয়ে গেলাম।'

কৃষ্ণা চলে' গেল। ঘরের বাতাস যেন সিসের মত ভারী। হেমলতা সকাল বেলাতেই মাথার ওষুধটা লাগাতে বসলেন।

ক্রমশঃ

সমুদ্রের স্বাদ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'...যে বিশাল লবণাক্ত জলরাশি...'

সমুদ্র দেখিবার সাধটা নীলার ছেলেবেলার। কিছুদিন স্কুলে পড়িয়াছিল। ভূগোলে পৃথিবীর স্থলভাগ আর জলভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু তার অনেক আগে হইতেই নীলা জানিত পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। সাতবছর বয়সে বাবার মুখে খবরটা শুনিয়া কি আশ্চর্য্যই সে হইয়া গিয়াছিল! একি সম্ভব? কই, সে তো রেলে চাপিয়া কত দূর দেশে ঘুরিয়া আসিয়াছে, মামা বাড়ী যাইতে সকাল বেলা রেলে উঠিয়া সেই রাত্রিবেলা পর্য্যন্ত ক্রমাগত হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতে হয়, কিন্তু নদীনালা খালবিল ছাড়া জল তো তার চোখে পড়ে নাই, চারিদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে জঙ্গল, আকাশ পর্য্যন্ত শুধু মাটি আর গাছপালা।

তারপর কত ভাবে কত উপলক্ষে ছাপার অক্ষর, মুখের কথা আর স্বপ্নের বাহনে সমুদ্র তার কাছে আসিয়াছে। বলাইদের বাড়ীর সকলে পুরী গিয়া কেবল সমুদ্র দেখা নয়, সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিল। কলিকাতার সায়েব-কাকার ছেলে বিমলা বিলাত গেল,—সমুদ্রের বুকেই নাকি তার কাটিয়া গেল অনেকগুলি দিন। সমুদ্রের জল মেঘ হইয়া নাকি বৃষ্টি নামে, মাছ তরকারীতে যে নুন দেওয়া হয় আর থালার পাশে একটুখানি যে নুন দিয়া মা ছ'বেলা ভাত বাড়িয়া দেন, সে নুন নাকি তৈরী হয় সমুদ্রের জল শুকাইয়া! সারাদিন গরমে ছটফট করিবার পর সন্ধ্যাবেলা যে ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগানোর জন্য তারা ছাদে গিয়া বসে, সে বাতাস নাকি আসে সোজা সমুদ্র হইতে।

'সমুদ্দুর বুঝি দক্ষিণ দিকে বাবা?'

'চাঁদিকেই সমুদ্দুর আছে। দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর—আমাদের খুব কাছে।'

ঠিক। ম্যাপে তাই আঁকা আছে। কিন্তু চারিদিকে সমুদ্র? উত্তর দিকে তো হিমালয় পর্ব্বত, তারপর তিব্বত আর চীন! ম্যাপটা আবার ভাল করিয়া দেখিতে হইবে।

'আমায় সমুদ্দুর দেখাবে বাবা?'

বাবা অনেকবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এবারও দিলেন। সমুদ্র দেখার আর হাঙ্গামা কি? একবার তীর্থ করিতে পুরীধামে গেলেই হইল, সুবিধামত একবার যাইতেও হইবে, নীলার মার অনেক দিনের সাধ। কিন্তু কেরাণীর স্ত্রীর সহজ সাধও কি সহজে মিটিতে চায়! অনেক কষ্টে একরকম মরিয়া হইয়া একটা বিশেষ উপলক্ষে স্ত্রীর সাধটা যদিবা মেটানো চলে, ছেলেমেয়ের সাধ অপূর্ণই থাকিয়া যায়।

রথের সময় যে ভীড়টাই হয় পুরীতে, ছেলেমেয়েদের কি সঙ্গে নেওয়া চলে? তাছাড়া, সকলকে সঙ্গে নিলে টাকায়ও কুলায় না। একজনকে নিলে অন্যসকলে কি দোষ করিল? নীলা সঙ্গে গেলে ছোটভাই-বোনদের দেখাশোনাই বা করিবে কে?

নীলাকে সঙ্গে না নেওয়ার আরও কারণ আছে।

'না গো, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নিয়ে ওই হট্টগোলের মধ্যে যাবার ভরসা আমার নেই।'

বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কিন্তু বিয়ের অযুগ্যি অবুঝ মেয়ের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল কয়েকদিন চোখের জলের নোন্‌তা স্বাদ ছাড়া জিভ যেন তার অন্য কিছুর স্বাদই ভুলিয়া গেল। মা বাবা তীর্থ সারিয়া ফিরিয়া আসিলে কোথায় হাসিমুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করিবে, তীর্থযাত্রার গল্প শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, একটি প্রশ্ন করিয়াই নীলা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

'সমুদ্দুরে চান করেছ বাবা?'

গাড়ী হইতে নামিয়া সবে ঘরে পা দিয়াছেন, নীলার বাবা বসিয়া বলিলেন, 'করেছি রে, করেছি। একটু দাঁড়া, জিরিয়ে নিই, বলব'খন সব।'

কি বলিবেন? কি প্রয়োজন আছে বলিবার? নীলা কি পুরীর সমুদ্র স্নানের বর্ণনা শোনে নাই, বলাইদের বাড়ীর তিনতলার ছাতে উঠিয়া চারিদিকে যেমন আকাশ পর্য্যন্ত ছড়ানো স্থির অনড় রাশি-রাশি বাড়ী দেখিতে পায়, তেমনি সীমাহীন জলরাশিতে বাড়ীর সমান উঁচু ঢেউ উঠিতেছে নামিতেছে আর তীরের কাছে বালির উপর আছড়াইয়া পড়িয়া সাদা ফেনা হইয়া যাইতেছে, এ কল্পনায় কোথাও কি এতটুকু ফাঁকি আছে নীলার? কেবল চোখে দেখা হইল না, এই যা। বাপের আদরে মেয়ে সে, অন্ততঃ সকলে তাই বলে, তার সমুদ্র দেখা হইলনা কিন্তু বাপ তার সমুদ্র দেখিয়া, স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। নীলা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবা তাড়াতাড়ি আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'পুজোর সময় যেমন করে' পারি তোকে সমুদ্র দেখিয়ে আনব নীলা, ধার করতে হ'লে তাও করব। কাঁদিস নে নীলা, সারারাত গাড়ীতে ঘুমোতে পাইনি, দোহাই তোর কাঁদিসনে।'

সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার বদলে পূজার সময় নীলাকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বলাই বাহুল্য যে, এবার সমুদ্র দেখা হইল না বলিয়া নীলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া চোখের জলের নোন্‌তা স্বাদে আর সবকিছুর স্বাদ ডুবাইয়া দিল না, কাঁদিল সে বাপের শোকেই। কেবল সে নয়, বাড়ীর সকলেই কাঁদিল। কিছুদিনের জন্য মনে হইল, একটা মানুষ, বিশেষ অবস্থার বিশেষ বয়সের বিশেষ একটা মানুষ, চিরদিনের জন্য নীলার মনের সমুদ্রের মত দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময় একটা সীমাহীন কিছুর ওপারে চলিয়া গেলে, সংসারে মানুষের কান্না ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না।

ছেলেবেলা হইতে আরও কতবার নীলা কাঁদিয়াছে। বাড়ীর শাসনে কাঁদিয়াছে, অভিমানে কাঁদিয়াছে, খেলার সাথীর সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় কাঁদিয়াছে, পেটের ব্যথায় ফোড়ার যাতনায় কাঁদিয়াছে, সমুদ্র দেখার সাধ না মেটায় কাঁদিয়াছে, অকারণেও যে দু'চার বার কাঁদে নাই এমন নয়। এমন কষ্ট হয় কাঁদিতে!—দেহের কষ্ট, মনের কষ্ট। শরীরটা যেন ভারী হইয়া যায়, অর হওয়ার মত সর্ব্বাঙ্গে অস্বস্তিকর ভোঁতা টনটনে যাতনা বোধ হয়, চিন্তাজগৎটা যেন বর্ষাকালের আকাশের মত ঝাপ্‌সা হইয়া যায়, একটা চিরস্থায়ী ভিজা স্যাঁতসেঁতে ভাব থমথম করিতে থাকে। শরীর ও মন দু'রকম কষ্টেরই আবার স্বাদ আছে,—বৈচিত্র্যহীন আলুনি অথচ কড়া নোন্‌তা স্বাদ।

স্বাদটা অনুভব করিবার সময় নীলার লাগে একরকম, আবার কল্পনা করিবার সময় লাগে

অন্যরকম—রক্তের স্বাদের মত। ছুরি দিয়া পেন্সিল কাটিতে, বঁটি দিয়া তরকারী কুটিতে, কোন-কিছু দিয়া টিনের মুখ খুলিতে, নিজের অথবা ভাইদের আঙুল কাটিয়া গেলে তার প্রচলিত চিকিৎসার ব্যবস্থা অনুসারে নীলা কাটাস্থানে মুখ দিয়া চুষিতে আরম্ভ করে,—রক্তের স্বাদ তার জানা আছে।

নীলার বাবার মৃত্যুর পর সকলে মামাবাড়ী গেল। বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া অতদূর মফঃস্বলের ছোট সহরে যাওয়ার ইচ্ছা নীলার মার ছিল না। তিনি বলিলেন, 'আর ক'টা মাস থেকে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে গেলে হ'তনা মামা?' একটা ছোটখাট বাড়ী ঠিক করে' নিয়ে—'

মেজমামা বলিলেন, 'মাথা খারাপ নাকি তোর? অরক্ষণীয়া নাকি মেয়ে তোর? বাপ মরেছে, একটা বছর কাটুক না।'

'ও!' বলিয়া নীলার মা চুপ করিয়া গেলেন।

কেবল তাই নয়, সহরে তাদের দেখাশোনা করিবে কে, খরচ চালাইবে কে? মামারা তো রাজা নন। সুতরাং সকলে মামাবাড়ী গেল। সকালে গাড়ীতে উঠিয়া অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত হু হু করিয়া চলিলে যেখানে পৌঁছানো যায়। যাত্রার পরিবর্ত্তন হয় নাই, অনেককালের ভাঙা ঘাটওয়ালা পানাভরা পুকুরটার দক্ষিণে ছোট আমবাগানটির কাছে নীলার দুই মামার বাড়ীটিরও পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল মামারা, মামিরা, আর মামাতো ভাইবোনেরা এবার যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই মামাবাড়ীর আদর, সকলের আনন্দ গদগদ ভাব, অফুরন্ত উৎসব? এবার ভো একবারও কেউ বলিল না, এটা খা ওটা খা? তার বাবার জন্য কাঁদাকাটা শেষ করিয়া ফেলিবার পরেও তো বলিল না? একটু কাঁদিবে নাকি নীলা, বাবার জন্য মাঝে মাঝে যেটুকু কাঁদে তারও উপরে মামাবাড়ীর অনাদর অবহেলার জন্য আরও একটু বেশী?

কিছুকাল কাটিবার পর এ বিষয়ে ভাবিয়া ঠিক করিবার প্রয়োজনটা মিটিয়া গেল, আপনা হইতেই যথেষ্ট কাঁদিতে হইল নীলাকে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় তো নীলা জীবনে কখনো পরে নাই, গোবর দিয়া ঘর লেপে নাই, পানাপুকুরে বাসন মাজে নাই, কলসী কাঁখে জল আনে নাই, বিছানা তোলা, মসলা বাটা, রান্না করা লইয়া দিন কাটায় নাই, এমন ভয়ানক ভয়ানক খারাপ কথার বকুনিও শোনে নাই। হায়, একটু ভাল জিনিষ পর্য্যন্ত সে যে খাইতে পায় না, এমনিই তার শরীরের নাকি এমন পুষ্টি হইয়াছে কোন ভদ্রঘরের মেয়ের যা হয় না, হওয়া উচিত নয়! কিন্তু তারই না হয় অভদ্ররকমের দেহের পুষ্টি হইয়াছে, তার ভাইবোনেরা তো রোগা, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে ওরাও একটু দুধ পায় না কেন, পিঠা পায়েসের ভাগটা ওদের এত কম হয় কেন? এমন ভিখারীর ছেলের মত বেশ করিয়া তার ভাই দু'টকে স্কুলে যাইতে হয় কেন? মামাদের জন্য ভাইরা যে তার দু'বেলা খাইতে পাইতেছে, স্কুলে পড়িতে পাইতেছে, এটা নীলার খেয়ালও থাকে না, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে নিজের ভাইবোনদের আহার-বিহারের স্বাভাবিক পার্থক্যটা তাকে কেবলি কাঁদায়।

বড় মামী বলেন, 'বড় তো ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে তোমার ঠাকুরঝি?'

মেজমামী বলেন, 'আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথাটি খেয়েছ ঠাকুরঝি।'

নীলার মা বলেন, 'দাওনা তোমরা ওর একটা গতি করে', মেয়ে যে দিন দিন কেমনতরো হয়ে যাচ্ছে?'

পাত্র খোঁজা হইতে থাকে আর নীলা ভাবিতে থাকে, বিবাহ হইয়া গেলে সে কি আবার

সহরের সেই বাড়ীর মত একটা বাড়ীতে গিয়া থাকিতে পাইবে, সকলের আদর যত্ন জুটিবে, অবসর সময়ে বলাইদের মত কোন প্রতিবেশীর তিনতলা ছাতে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ীর সমুদ্র দেখিতে পাইবে, বলাই-এর মত কারও কাছে সমুদ্রের গল্প শোনা চলিবে? ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে নীলার একটি ভাই মরিয়া গেল। নীলার মা কি একটা অজানা অসুখে ভুগিতে ভুগিতে শয্যা গ্রহণ করিলেন। বড়মামার মেজ মেয়ে সন্তান প্রসব করিতে বাপের বাড়ী আসিয়া একখানা চিঠির আঘাতে একবারে বিধবা হইয়া গেল। পানাভরা পুকুরটার অপর দিকের বাড়ীতেও একটি মেয়ে আরও আগে সন্তানের জন্ম দিতে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল, একদিন রাতভোর চেঁচাইয়া সে নিজেই মরিয়া গেল। আমবাগানের ওপাশে আটদশখানা বাড়ী লইয়া যে-পাড়া, সেখানেও পনের দিন আগে-পিছে দু'টি বাড়ী হইতে বিনাইয়া বিনাইয়া শোকের কান্না ভাসিয়া আসিতে শোনা গেল।

তারপর একদিন অনাদি নামে সদর হাসপাতালের এক কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে নীলার বিবাহ হইয়া গেল। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেই একরকম স্বীকার করিল যে, ধরিতে গেলে নীলার বিবাহটা মোটামুটি ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। মেয়ের তুলনায় ছেলের চেহারাটাই কেবল একটু বা বেমানান হইয়াছে। কচি ডাল ভাঙিয়া ফেলিলে শুকাইয়া যেমন হয় কতকটা সেইরকম শুষ্ক ও শীর্ণ চেহারা অনাদির, ব্রণের দাগ-ভরা মুখের চামড়া কেমন মরা মরা, চোখ দু'টি নিষ্প্রভ, দাঁতগুলি খারাপ। এদিকে মামাবাড়ীর অনাদর অবহেলা সহিয়া এবং বাবা ও ছোটভাইটির জন্য কাঁদিয়াও নীলার চেহারাটি বেশ একটু জমকালো বৈকি, একটু অতিরিক্ত পরিপাটা আছে বৈকি তার নিটোল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির গঠন-বিন্যাসে।

কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবার নাই, মুখ বুজিয়া সব মানিয়া লইতে হইবে। বিশেষ আর এমন কি পরিবর্তন হইয়াছে জীবনের? কেবল বাস করিতে হয় অজানা লোকের মধ্যে, যাদের কথা-বার্তা চালচলন নীলা ভাল বুঝিতে পারে না; আর রাত্রে শুইয়া থাকিতে হয় একটি আধ-পাগলা মানুষের কাছে, যার কথাবার্তা চালচলন আরও বেশী দুর্বোধ্য মনে হয় নীলার। কোনদিন রাত্রে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর ছুটি পাইয়া ঘরে আসিবামাত্র অনাদি দরজায় খিল তুলিয়া দেয়, হাত ধরিয়া উর্দ্ধশ্বাসে কি যে সে বলিতে আরম্ভ করে নীলা ভাল বুঝিতেই পারে না। কেবল বুঝিতে পারে আবেগে, উত্তেজনায় অনাদি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখের দৃষ্টি তার উদ্‌ভ্রান্ত। মনে হয়, নীলার আসিতে আর একটু দেরী হইলে সে বুঝি বুক ফাটিয়াই মরিয়া যাইত। কোনদিন স্বরে আসিয়া দেখিতে পায় অনাদির মুখে গভীর বিষাদের ছাপ, স্তিমিত চোখে দৃষ্টি আছে কিনা সন্দেহ। ঘুম আসে নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিলেও ঘুম যে আজ তার আসিবেনা নীলা তা জানে, কিন্তু হাই সে তুলিতেছে মিনিটে মিনিটে।

কি বলিবার আছে, কি করিবার আছে? হয় দাঁতের ব্যথা, নয় মাথা ধরা, নয় জ্বরভাব, অথবা আর কিছু অনাদিকে প্রায়ই রাত জাগায়, অন্যদিন সে রাত জাগে নীলার জন্য। সুযোগ পাইলেই নীলা চুপি চুপি নিঃশব্দে কাঁদে। সজ্ঞানে মনের মত স্বামীলাভের তপস্যা সে কোনদিন করে নাই, কি রকম স্বামী পাইলে সে সুখী হইবে কোনদিন এ কল্পনা তার মনে আসে নাই, সুতরাং আশাভঙ্গের বেদনায় সে কাঁদে না। আশাই সে করে নাই, তার আবার আশাভঙ্গ কিসের? অনাদির সোহাগেই

সোহাগ পাওয়ায় সাধ মিটাইয়া নিজেকে সে কৃতার্থ মনে করিতে পারিত, উত্তেজনা ও অবসাদের নাগরদোলায় ক্রমাগত স্বর্গ ও নরকে ওঠা-নামা করার যে চিরন্তন প্রথা আছে জীবনযাপনের, তার মধ্যে নরকে নামাকে তুচ্ছ আর বরদাস্ত করিয়া দিয়া সকলের মত সেও একটা বিশ্বাস জন্মাইয়া নিতে পারিত যে স্বর্গই সত্য, বাকী সব নিছক দুঃস্বপ্ন। কিন্তু স্বামীই তো মেয়েের সব নয়, জীবনের একটা বড়রকম প্রত্যাবর্ত্তন তো নীলা আশা করিয়াছিল, যে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সহরে তাদের সেই আগেকার বাড়ীতে থাকা, সকলের না হোক অন্ততঃ একজনের কাছে সেইরকম আদর যত্ন পাওয়া, অবসর সময় বলাইদের মত কোন প্রতিবেশীর তিনতলা বাড়ীর ছাতে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ীর সমুদ্র দেখা আর বলাই-এর মত কারও মুখে আসল সমুদ্রের গল্প শোনার মোটামুটি একটা মিল আছে? এখানে নীলাকে বিশেষ অনাদর কেউ করে না, লজ্জায় কম করিয়া খাইলেও মামাবাড়ীর চেয়ে এখানেই তার পেটভরা খাওয়া জোটে, এখানে তাকে যে দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া হয় নাই এখানে থাকিবার স্বাভাবিক অধিকারই তার আছে, এটা সকলে যেমন সহজভাবে মানিয়া লইয়াছে সে নিজেও তেমনি আপনা হইতেই অনুভব করিয়াছে, মামাবাড়ীর চেয়েও এখানকার অজানা অচেনা নরনারীর মধ্যে ঘোমটা-দেওয়া বধূজীবন যাপন করিতে আসিয়া নীলা তাই স্বস্তি পাইয়াছে অনেক বেশী। তবু একটা অকথ্য হতাশার তীব্র ঝাঁঝালো স্বাদ প্রথম সে অনুভব করিয়াছে এখানে। গুমরাইয়া গুমরাইয়া এই কথাটাই দিবারাত্রি মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতেছে যে সব তার শেষ হইয়া গিয়াছে, কিছুই তার করার নাই, বলার নাই, পাওয়ার নাই, দেওয়ার নাই—শানাই বাজাইয়া একদিনে তার জীবনের সাধ আহ্লাদ সুখ দুঃখ আশা আনন্দের সমস্ত জের মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'কাঁদছ নাকি? কি হয়েছে?'

'কাঁদি নি তো।'

কাঁদিতে কাঁদিতেই নীলা বলে সে কাঁদে নাই। জানুক অনাদি, কি আসিয়া যায়? কাঁদা আর না-কাঁদা সব সমান নীলার। নীলার কান্নার মৃতসঞ্জীবনী যেন হঠাৎ জীবন আনিয়া দিয়াছে এমনি ভাবে অনাদি তাকে আদর করে, ব্যাকুল হইয়া জানিতে চায় কেন কাঁদিতেছে নীলা, কি হইয়াছে নীলার? এখানে কেউ গালমন্দ দিয়াছে? মা বোনের জন্য মন কেমন করিতেছে? অনাদি নিজে না জানিয়া মনে কষ্ট দিয়াছে তার? একবার শুধু মুখ ফুটিয়া বলুক নীলা, এখনিই অনাদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

কিন্তু কি বলিবে নীলা, বলার কি আছে? সে কি নিজেই জানে কেন সে কাঁদিতেছে। আগে প্রত্যেকটি কান্নার কারণ জানা থাকিত, কোন্ কান্না বকুনির, কোন্ কান্না অভিমানের, কোন্ কান্না শোকের আর কোন্ কান্না সমুদ্র দেখার সাধের মত জোরালো অপূর্ণ সাধের। আজকাল সব যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। কান্নার সমস্ত প্রেরণাগুলি যেন দল বাঁধিয়া চোখের জলের উৎস খুলিয়া দেয়।

সেদিন অনাদি ভাবে, কান্নার কারণ অবশ্যই কিছু আছে, নীলা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। পরদিন আবার তাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে রীতিমত ভড়কাইয়া যায়, কান্নার কারণটা তবে তো নিশ্চয় গুরুতর! আরও বেশী আগ্রহের সঙ্গে সে কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং কিছুই জানিতে না পারিয়া সেদিন তার একটু অভিমান হয়। তারপর দু'দিন নীলা কাঁদে কিনা সেই জানে, দাঁতের ব্যথা আর মাথার যন্ত্রণায় বিব্রত থাকায় অনাদি টের পায় না।

পরদিন আবার নীলার কান্না সুরু হইলে রাগ করিয়া অনাদি বলিল, 'কি হয়েছে, যদি নাই বলবে, বারান্দায় গিয়ে কাঁদো, আমায় জালিও না।'

এতক্ষণ কাঁদিবার কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিলনা, এবার স্বামীর এমন একটা কড়া ধমক খাইয়া নীলা অনায়াসে আরও বেশী আকুল হইয়া কাঁদিতে পারিত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ধমক খাওয়া মাত্র নীলার কান্না একেবারে থামিয়া গেল।

'দাঁত ব্যথা করছে তোমার?'

অনাদি বলিল, 'না।'

'মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে ?'

'না।'

'তবে?'—নীলা যেন অবাক হইয়া গিয়াছে। দাঁতও ব্যথা করিতেছে না, মাথারও যন্ত্রণা নাই, কাঁদিবার জন্য তবে তাকে ধমক দেওয়া কেন, বারান্দায় গিয়া কাঁদিতে বলা কেন? দাঁতের ব্যথা মাথার যন্ত্রণা না থাকিলে তো তার প্রায় নিঃশব্দ কান্নায় অনাদির অসুবিধা হওয়ার কথা নয়!

তারপর ধমক দিয়া কয়েকবার নীলার কান্না বন্ধ করা গেল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে ধমকেও আর কাজ দিল না। মাঝে মাঝে তুচ্ছ উপলক্ষ্যে, মাঝে মাঝে কোন উপলক্ষ্য ছাড়াই নীলা কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল, তার একটা উদ্ভট ও দুর্নিবার পিপাসা আছে, নিজের নাকের জল চোখের জলের স্রোত অনেকক্ষণ ধরিয়া অবিরাম পান না করিলে তার পিপাসা মেটে না।

তারপর ক্রমে ক্রমে অনাদি টের পাইতে থাকে বৌ-এর তার কান্নার কোন কারণ নাই, বৌটাই তার ছিঁচ্‌কাঁদুনে, কাঁদাই তার স্বভাব।

অনাদির মা-ও কথাটায় সায় দিয়া বলেন, 'এ্যাদ্দিন বলিনি তোকে, কি জানি-হয়তো ভেবে বসবি আমরা যন্ত্রণা দিয়ে বৌকে কাঁদাই, তোর কাছে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছি—বড্ড ছিঁচকাঁদুনে বৌ তোর। একটু কিছু হ'ল তো কেঁদে ভাসিয়ে দিল। আগে ভাবতাম বৌ বুঝি বড্ড অভিমানী, এখন দেখছি তা তো নয়, এ যে ব্যারাম। আমাদের কিছু বলতে কইতে হয় না, নিজে নিজেই কাঁদতে জানে। ওবেলা ও-বাড়ীর কানুর মা মহাপ্রসাদ দিতে এলো, বসিয়ে দুটো কথা বলছি, বৌ কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে, বলা নেই কওয়া নেই ভেউ ভেউ করে' সে কি কান্না বৌয়ের! সমুদ্দুরে চান করার গল্প থামিয়ে কানুর মা তো থ বনে' গেল। যাবার সময় চুপি চুপি আমায় বলে' গেল, বৌকে মাদুলী তাবিজ ধারণ করাতে। এসব লক্ষণ নাকি ভাল নয়।

অনাদির মা কান পাতিয়া শোনে, দরজার আড়াল হইতে অস্ফুট একটা শব্দ আসিতেছে।

'ঐ শোন্। শুনলি?'

বাহিরে গিয়া অনাদি দেখিতে পায়, দরজার কাছে বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া নীলা বঁটিতে তরকারী কুটিতেছে। একটা আঙুল কাটিয়া গিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে, সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে।

মার্কস্‌বাদের গোড়ার কথা ও হেগেলীয় ডায়ালেক্‌টিক্

হীরালাল দাশ-গুপ্ত

কার্ল মার্কসের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে এবং মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে বহু প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিলো এবং হয়েছে—রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানব-জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন দেশে ও কালে—এ কথা সত্যি—কিন্তু কার্ল মার্কসের মতন অন্য কোনো মনীষি মানুষের সমাজ-জীবনে এরূপ গভীর ও ব্যাপক প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। এবং অন্য কোনো মতবাদ নিয়ে গত এক শত বৎসরের মধ্যে এমনি তর্ক-বিতর্ক আলাপ-আলোচনা ও আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা মজার কথা এই, যে সেই ইংলণ্ডের লেবার পার্টির দুই নেতার বিরোধের মতন মার্কস্‌পন্থীদের মধ্যে মতোভেদ ও মনোভেদের আর অন্ত নেই এবং প্রত্যেক মার্কস্‌বাদীই চিন্তায় হোক, কার্য্যে হোক কিংবা শুধু প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখেই হোক, প্রত্যেক মার্কসবাদীই মনে করেন, যে তিনিই একমাত্র মার্কসকে যথার্থ বুঝতে পেরেছেন, আর কেউই পারেন নি। এই আঘাত-সংঘাত এবং অপঘাতের উপরই প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান রাশিয়ার শাসনতন্ত্র।

যদি প্রশ্ন না করে', তর্ক না করে' বর্ত্তমান বাস্তব সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য না ঘটিয়ে অবিজ্ঞানীর মতন অন্ধভাবে মার্কস-ব্যবহৃত শব্দগুলোকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে' মার্কস্‌-উপলব্ধ জীবন্ত, প্রবর্ত্তন-সুলভ সত্যকে অস্বীকার করাই হয় মার্কসবাদী হওয়া, তাহলে আমি মার্কসবাদী নই। গোড়াতেই এ সত্য স্বীকার করতে হবে, যে মার্কসবাদের সব চাইতে বড় কথা এর প্রবর্ত্তন-সুলভতা—flexibility. এমন অনেক মার্কসবাদী আছেন এবং এঁদের সংখ্যাই বেশী, যাঁরা মনে করেন, যে মার্কস যে-কথা যেমনভাবে ১৮৪৮ কিংবা ১৮৮৩ সালে লিখেছিলেন, বেঁচে থাকলে সেই কথা ঠিক তেমনিভাবেই তিনি ১৯৩৯ সালেও লিখতেন। এর চাইতে মূর্খতা আর কি হ'তে পারে? এবং তাঁদের সংখ্যাও কম নয় যাঁরা Das Kapital এবং The Communist Manifesto মুখস্ত করে' ভাবেন, যে মহাযুদ্ধ পরবর্ত্তী সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মূল সূত্রগুলির ও সমস্যার সন্ধান ও সমাধান একমাত্র তাঁরাই জানতে পেরেছেন। এর চাইতে হাস্যকর আর কিছু নেই।

কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই তাঁর যুগকে অতিক্রম করে' চিন্তা করেন না, অর্থাৎ একথা বলা চলে না, যে পরবর্ত্তী যুগে পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর চিন্তাপ্রণালী সমভাবে প্রযোজ্য, যদিচ তার মূল ভিত্তির উপরে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের ইমারৎ গড়ে' তোলা চলে। যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার এবং যে কোনো সমস্যার সমাধান করবার জন্য আমাদের বর্ত্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বস্তুর প্রধান গুণ—এই দৃশ্যমান বিরাট বিশ্ব-জগতের প্রধান প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীলতা। একে স্বীকার না করার অর্থ সত্যকে উপেক্ষা করা। সুতরাং মানব-সমাজকে স্বীকার করে' তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে আমাদের প্রতি সমাজের স্বকীয়তা ও নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীলতা—ক্রমপ্রকাশ—পরিণতি ও ধ্বংসকে স্বীকার করতে হবে—স্বীকার করতে ও বিচার করতে হবে এর অতীত ইতিহাস ও ক্রম-পরিবর্ত্তনশীল বর্ত্তমান পরিস্থিতি। অতএব, সমস্ত ধনতান্ত্রিক সমাজ ও যান্ত্রিক সভ্যতার সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধাননীতি গতি-বৈজ্ঞানিক হওয়া প্রয়োজন। গোঁড়া অর্থবিজ্ঞানী এবং মার্কসের মধ্যে এইখানেই মূল পার্থক্য, যেহেতু রিকার্ডো হ'তে সুরু করে' সমস্ত পরবর্ত্তী অর্থ-বিজ্ঞানবিদেরা এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করে' অর্থনৈতিক বাস্তব জগতকে অবিচ্ছিন্ন এবং নিশ্চল, গতিশূন্য, এবং সেহেতু সমাজ ও সভ্যতাকে প্রথমে কতকগুলি প্রাণহীন প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি বলে' অঙ্গীকার করে' পরে গতি ও পরিবর্ত্তনশীলতা আরোপ করে' সেই বিখ্যাত "Equilibrium analysis"-নীতির প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং আমাদের বিশ্লেষণ ও বিচার ও উপলব্ধির বিষয় এই প্রাণবন্ত, গতিশীল, বাস্তব জগৎ, এর ঘাত প্রতিঘাত, আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন ও বিলোপ—কোনো অবিচ্ছিন্ন, গতিহীন, কাল্পনিক পৃথিবী নয়।

প্রথম প্রাগান্ত বস্তুর—কল্পনার নয়—যেহেতু কল্পনা বস্তুবিষয়ক, বস্তু কল্পনাবিষয়ক নয়। অর্থাৎ বিষয় কিংবা বস্তু সম্বন্ধেই মানুষের ধারণা বা কল্পনা—ধারণা বা কল্পনা সম্বন্ধে বিষয় বা বস্তু নয়। এবং যদিচ, সমগ্র ইতিহাসে বস্তু ও কল্পনা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রভাব বিস্তার করে' থাকে এবং কল্পনা বস্তুর প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন এনে দেয়, তত্রাচ এ-কথা, অস্বীকার করবার উপায় নেই, যে কল্পনাকে সৃষ্টি শক্তিশালী করতে হ'লে তাকে দিতে হবে প্রাণবান বস্তুর রূপ—চিরন্তন-স্পন্দিত—নিত্য-গতিশীল রক্ত মাংসের আকার। এইখানে—এই সত্যের মধ্যেই মার্কসীয় ঐতিহাসিক জড়বাদের ভিত্তি।

প্রাকৃতিক বস্তু—নদ-নদী—পাহাড়-পর্ব্বত—বন-জঙ্গল—গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য এবং সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে মানুষ শারীর শক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহায্যে প্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তন করে' যে-সব বস্তু সৃষ্টি করেছে সে সমুদয়ই সামাজিক বিপ্লবের প্রধান কারণ। হেগেলীয় দার্শনিক আদর্শবাদ থেকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে পৃথক-করণ উদ্দেশ্যেই মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক মতবাদকে জড়বাদী আখ্যা দিয়েছেন। যদিচ মার্কস হেগেলীয় আইডিয়ালিস্‌ম-এর পাল্‌টা উত্তর হিসাবে ম্যাটিরিয়ালিস্‌ম শব্দ ব্যবহার করেছেন, তত্রাচ এখানে materialism-এর অর্থ আমরা বর্ত্তমানে যাকে বলে' থাকি Realism, যথার্থ তাই।

হেগেল ও অন্যান্য দার্শনিক আদর্শবাদীদের মতে আইডিয়াই হচ্ছে ব্যক্তি বা বস্তুর ব্যবস্থা বা অস্তিত্বের আদি সত্ত্বা। এই দৃশ্যমান গতিশীল বিশ্ব-পৃথিবী সেই আইডিয়া বা অশরীরী অস্তিত্বের ধূসর ছায়া—প্রেতায়িত প্রতিচ্ছবি। যা-কিছুর অস্তিত্বের আমরা অনুভব করি অর্থাৎ এই প্রাণবন্ত পরমাণুর পৃথিবী—এই দেখা-শোনার, শব্দের, স্পর্শের, ঘ্রাণের জগৎ—সেই মহা-আইডিয়ারই

অসম্পূর্ণ অনুলিপি। সুতরাং অবস্থিতি এবং বিস্তৃতির পূর্ব্বে অনুভূতি—চেতনা-মনের প্রধান লক্ষণ। "There are no things : there are only thoughts thinking them." অর্থাৎ বস্তু বলে' কিছু নেই—অনুভূতিই আপনাকে অনুভব করে। কিন্তু মনের পশ্চাতে মস্তিষ্ক—কল্পনার পশ্চাতে কল্পনাকারী—ভাবের পশ্চাতে ভাবুক রয়েছে। আদর্শবাদীদের মতে, কোন চিন্তা বা কল্পনা বা আইডিয়াই সত্য কিংবা সম্পূর্ণ নয়, সমস্ত চিন্তা কিংবা কল্পনার আদি কারণ ও উৎপত্তি একক বিশ্ব-মন। এবং সমগ্র মনন-ক্রিয়ার অস্তিত্ব এই বিশ্ব-মনের মধ্যে।

হেগেলের মতে সমগ্র সভ্যতা এবং মানব-ইতিহাস সেই আইডিয়ারই রূপান্তর বিশেষ। এবং এই আইডিয়ারই মধ্যে সমগ্র বস্তুর অস্তিত্ব। এই হেগেলীয় আদর্শবাদেরই প্রতিউত্তর মার্কসীয় বাস্তববাদ। এই হেগেলীয় বিবর্ত্তনবাদকেই কার্লমার্কস্ আরোপ করেছেন এই অভিজ্ঞতার বাস্তব পৃথিবীর উপর। যে-পৃথিবীকে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করি, মনের সাহায্যে উপলব্ধি করি, সেই রূপের, রসের শব্দের, স্পর্শের, মাটির পৃথিবী প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জ মাত্র নয়, প্রাণবান, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল; প্রতিমুহূর্ত্তে তার রূপান্তর—নবজন্ম—নতুন জীবন, নতুন মৃত্যু। এই আঘাত, সংঘাত ও সময়য়ের মধ্য দিয়েই সমাজ ও সভ্যতা নিত্য নতুনরূপ লাভ করে। এই নিরন্তর দ্বন্দ্বের, ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই হেগেলীয় আইডিয়ার ক্রম-বিবর্ত্তন। আংশিক সত্য প্রকাশক প্রতি আইডিয়ারই একটা বিপরীত ও বিরোধী আইডিয়া আছে, যে বিরোধী আইডিয়াও একটা আংশিক সত্য প্রকাশ করে মাত্র। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবের মধ্যে আর একটা তৃতীয় এবং বৃহত্তর ভাব জন্ম লাভ করে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংঘাতজাত তৃতীয় বৃহত্তর ভাবও একটা নতুন কিন্তু আংশিক সত্য প্রকাশ করে মাত্র। এবং এই তৃতীয় বৃহত্তর ভাবের মধ্যে আবার আর একটা নতুন ও বিরুদ্ধ ভাব জন্মলাভ করে। এইরূপে আঘাত-সংঘাত এবং সময়য়ের—থিসিস, য়্যান্টিথিসিস্ ও সিন্‌থিসিসের মধ্য দিয়ে সেই মহা আইডিয়া নিরন্তর আপনাকে প্রকাশ ও উপলব্ধি করে। ভাবের এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব, এই সত্য ও প্রতিসত্য ও সংশ্লেষণ একদিন সেই পরিপূর্ণ, অনন্তিক্রম্য সত্যে পরিণত হবে। এই হেগেলীয় থিসিস্, য়্যান্টিথিসিস্ ও সিনথিসিস্—সত্য, প্রতিসত্য ও সংশ্লেষণ-নীতির সাহায্যেই কার্লমার্কস্ এই বাস্তব জগৎ, এই অর্থনৈতিক য়ুভ্যতার সমগ্র সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। মার্কসের মতে এই আঘাত-সংঘাত-সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র মনুষ্যত্ব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিপূর্ণতার দিকে যুগে যুগে এগিয়ে যাচ্ছে। মার্কসের মতে এই ঘাত-প্রতিঘাত ও সংশ্লেষণ—ভাব, প্রতিভাব ও সময়য়ের—এই চির আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে যা প্রতিনিয়ত আপনাকে সেই এক সুসম্পূর্ণ, অনতিক্রম্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অপরিসীম ও নিরঙ্কুশ অবস্থায় রূপান্তরিত করতে চায় তা কোনো হেগেলীয় ভাব বা আইডিয়া নয়, তা এই জীবন! এইখানেই মার্কস্ ও হেগেলের বিরাট বৈষম্য। মার্কস বিশুদ্ধ বাস্তববাদী। সুতরাং তাঁর মতে এই ক্রমবিবর্ত্তন কোনও কল্পনা বা আইডিয়ার নয়—বস্তুর ও মানুষের। এই বিবর্ত্তন-বাদের রহস্য উদ্ঘাটন করতে এই পৃথিবীর বাইরে—এই শীত-গ্রীষ্ম শস্য ও ধাতুর প্রকৃতি এবং সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, জরা-মৃত্যুর জীবনের বাইরের কাল্পনিক কোনও কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

মানুষই তার ভাগ্যনিয়ন্ত্রা—কোনও কাল্পনিক অননুভূত, অবৈজ্ঞানিক অন্ধ দেবতা বা শক্তি নয়। শক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে—জ্ঞানের বিস্তার ও শক্তির উৎকর্ষে—প্রকৃতিকে প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন ও পরিশোধন করে' অর্থনৈতিক জগতে মানুষ আপন সার্থকতা উপলব্ধি করে। এই শক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কখনও বা সভ্যতাকে এক নতুনতর ও উচ্চতর স্তরে এগিয়ে দেয়, কখনও বা তাকে ধ্বংস করে' এক যুগের পুঞ্জীভূত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শক্তিকে চুরমার করে' আর এক অনাগত যুগকে নতুন করে' নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। এর অর্থ এই নয় যে, ইতিহাসের একমাত্র প্রধান অভিনেতা বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারকেরা—এর অর্থ এই নয় যে, লেনিন ব্যতীত রুশ-বিপ্লব, কিংবা নেপোলিয়ন ব্যতীত ফরাসী-বিপ্লব, কিংবা গান্ধী ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্ভব হ'ত না। মহাবিপ্লবের মূল কারণ শ্রেণী-স্বার্থ-সংঘাত—একই সভ্যতাধীন বিরুদ্ধ শ্রেণী-স্বার্থসংঘর্ষ। তথাকথিত মহামানবদের কীর্তিকলাপের প্রভূত মূল্য আছে—এ কথা যেমন স্বীকার্য্য, ঠিক তেমনি একথাও অস্বীকার্য্য নয় যে, ইতিহাসকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করে মানুষ যা পেয়েছে জন্মসূত্রে, আর যা-কিছু করারও করেছে শক্তি ও বিজ্ঞানের ব্যবহারে, তার সঙ্গে মানুষের মনের অবিরাম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই মানব সভ্যতার ইতিহাস। ভবিষ্যৎ সভ্যতার রূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বর্ত্তমান কালের মানুষের মনের গঠনের উপর। অর্থাৎ ইতিহাসে কিছুই অপ্রত্যাশী নয়, বাস্তবপক্ষে যে পর্য্যন্ত তা ইতিহাসে পরিণত না হয়। যাঁরা মনে করেন যে এই-এই বাস্তব অবস্থার ভবিষ্যৎ এই-এই রূপ না হ'য়েই যায় না, তাঁরা ভ্রান্ত। কারণ, সামাজিক কারণ সমূহ কখনই ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে সামাজিক মানুষ তার সমগ্র করণীয় শেষ না করেছে। সুতরাং, স্থান ও কাল নির্ব্বিশেষে যে সোশ্যালিস্‌ম-এর জয় হবেই এই মতবাদ মার্কসের মূর্খ ভক্তদের হ'তে পারে, মার্কসের কখনই হ'তে পারে না। সুতরাং, রাশিয়ায় যে-অবস্থার ফলে যে-অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, ঠিক ভারতবর্ষেও সেই অবস্থার ফলে সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হ'তেই হবে এমন কথা মার্কসের সমগ্র রাজনৈতিক রচনায় কোথাও লেখা নেই। যেহেতু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের মানুষের মন বিভিন্ন সেই হেতু ভিন্ন দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সামঞ্জস্য থাকলেও তার সমস্যা সমাধানের পথ এক হ'তে পারে না। মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক আবহাওয়া—এই দুইয়ের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতই ইতিহাসের প্রধান নির্দ্দেশী। অর্থাৎ সাম্যবাদের জয় কিংবা পরাজয়—অস্তিত্ব কিংবা অবলুপ্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সাম্যবাদীদেরই উপর।

পলায়ন

রজত সেন

ওরা জানতো যে ওদের বিয়ে একদিন হবেই—যেমন করেই হোক, কেন না—বিয়ে ত তাদের হবেই। সে-ভাবেই তারা নিজেদের তৈরী করছিলো। পরস্পরের সঙ্গ এবং সহযোগিতা তারা কামনা করতো সে-ভাবেই। নানা বাধা সত্ত্বেও তারা একত্র হ'ত, বেড়াতো এক সঙ্গে, সিনেমায় যেতো, রেস্তরাঁয় বসে' এক সঙ্গে চা খেতো; কোনদিন বা ট্রেনের ফার্ষ্টক্লাসে কাছে কোথাও বেড়িয়ে আসতো। যতটা সম্ভব তারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতো, বাঁচিয়ে চলতো নিজেদের। তাই বাইরের লোকের কাছে কোনদিন তাদের সংযম ভঙ্গ হয়নি। সময় এবং স্থান নির্ব্বাচন করে' তারা সাক্ষাৎ করতো।

'তোমার এ লুকোচুরি আমার ভাল লাগেনা মাধুরী!' বিভাস মাঝে-মাঝে রাগান্বিত হয়ে পড়তো।

'তাতে আমাদেরই সুবিধে!' হাসির উচ্ছ্বাসে মাধুরী ঝলমল করে' উঠতো, 'হাঙ্গামা আর অসুবিধে, মনোমালিন্য আর পক্ষচক্ষুর হাত থেকে নিষ্কৃতি, বুঝছো না?'

'কিন্তু এমন করে' কতদিন আর চলবে?' বিভাসের গলার স্বর তেমনি উদ্যত।

'যতদিন চলে!' মাধুরী করুণ হয়ে ওঠে, 'বোধহয় চিরজীবন।'

'কিন্তু তাতে লাভ কি নিজেদের এমনি বঞ্চিত করে?' বিভাস আহত হয়, 'বিয়েতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে—আপত্তি নেই সে ত তুমি বলেইছো—তবে অনর্থক নিজেদের বয়েস বাড়িয়ে লাভ কি?'

'কি জানি, কিন্তু এটা বুঝতে পারি সে-সময় এখনও আসেনি।'

সে-সময়ের জন্যে তারা বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে লাগলো। অবশেষে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। পথের মায়া তাদের তবু কমেনি, রেস্তরাঁয় বসে' আজও তারা চা খায়, অন্ধকার রাতে কোন নির্জ্জন পার্ক বা মাঠের মধ্যে চুপচাপ বসে' থাকে, পছন্দ করে' জিনিষপত্র কেনে। বিভাস পছন্দ করে মাধুরীর সাড়ীর পাড়, মাধুরী বিভাসের কোটের কাপড়।

আজও তেমনি বিভাস মাধুরীর হাতখানা টেনে নেয় পরম যত্নে এবং স্নেহে, হাত দিয়ে তার চুলের গোছা টেনে দেয় কানের পেছনে।

বিভাস একদিন হঠাৎ বলে, 'চল আমরা পালাই।' মাধুরী লক্ষ্য করে তার কম্পিত কণ্ঠ, মুখের কয়েকটি কঠিন রেখা।

'তারপর?' মাধুরী বিস্মিত হয়, ভয় পায়।

'তারপর আবার কি? আমরা এক সঙ্গে থাকবো, স্বাধীন, কোন লুকোচুরি নেই, কোন জানা-জানির ভয় নেই। তোমাকে আমি আরও কাছে পেতে চাই মাধুরী, আরও কাছে। যেখানে আমরা যাবো সেখানে আর কেউ থাকবে না, শুধু তুমি আর আমি; আমরা বিয়ে করবো।'

'না, সে হয়না, আমাদের বিয়ে হতে পারে না।'

'তাহ'লে থাকবো কেমন করে' এক সঙ্গে? বিয়েটা ত আর কিছু নয়, কতগুলি নৈমিত্তিক সুবিধে। কপালে সিঁদুর থাকলে কেউ আর কৌতূহল দেখাবে না, চমকে উঠবে না কেউ, দিতে হবে না অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তর, কান দিয়ে শুনতে হবে না নিন্দা আর অপবাদও এ-সব কি কম সুবিধে তুমি মনে কর?'

'তাহ'লে বিয়ের আর দরকার কি?' মাধুরী উত্তর দিলে, 'এমনিই ত খানিকটা সিঁদুর পরলে হয়।'

'তার মধ্যে প্রতারণা আছে, কিন্তু বিয়েতে তা নেই। চল আমরা পালাই।'

'তাহ'লে তোমাকে চাকরী ছাড়তে হয়।'

'তা হোক, চাকরী কোথাও জুটিয়ে নেওয়া যাবে, তোমারও বিদ্যে-বুদ্ধি আছে, তুমিও পারবে সহজেই একটা কাজ জুটিয়ে নিতে।'

মাধুরী উত্তর দেয় না, চুপ করে' থাকে। সেদিনের মত কোন সিদ্ধান্তেই তারা পৌঁছাতে পারে না।

আবার আর একদিন বিকেলে বিভাস বললে, 'আজ আর বাড়ী ফিরবো না।'

'তবে!'

'এই দেখ!' বিভাস তার কোটের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বা'র করে। 'আজ আমরা কোথাও চলে' যাবো, ফিরবো না আর। যা টাকা আমার কাছে আছে তাতে কয়েক বছর কিছু না করে' নিশ্চিন্তে চলে' যাবে।'

'এত টাকা পেলে কোথায়?'

'জোগাড় করেছি, যতদিন না কোন কাজ পাই—চলবে। চল আজই যাই।'

'কোথায় যাবে শুনি?' মাধুরী এক অদ্ভুত গ্রীবা-ভঙ্গি করে।

'যেখানে হয়, চল বেনারস, সেখানে খুব সস্তা থাকা আর খাওয়া, প্রথমে কয়েকটা ট্যুসানি জুটিয়ে নেবো, আমার এক বন্ধু সেখানে থাকে তাকে বলে', তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক করে' নেয়া যাবে। বেনারস যদি পছন্দ না হয় চল ভুবনেশ্বর, সেখানকার এক মঠে আমার সন্ন্যাসী বন্ধু আছে, তার আশ্রয় নেওয়া যাবে।'

'মেয়েমানুষকে তারা আশ্রমে রাখবে কেন?'

'আমরাই বা সেখানে থাকতে যাচ্ছি কেন? যতদিন না ভালো একটা বন্দোবস্ত হয় শুধু সে-কটা দিন।'

'তাঁকে কি পরিচয় দেবে?' মাধুরী জিজ্ঞেস করে।

'বলবো বৌ।'

'কতদিন লুকোচুরি করে' পারবে? একদিন না একদিন ধরা পড়বেই।'

'ধরা পড়বো কেন? তুমি ত সিঁদুর পরছো কপালে।'

কয়েক মিনিটের ছেদ।

'বুড়ো বাপ মা'কে এই সাঙ্ঘাতিক আঘাত দিতে তুমি আমায় বল?'

'বলি, তাঁরা ত জীবন উপভোগ করেছেন, ভোগ করেছেন যৌবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত। মেয়ের সুখ এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অধিকার ত তাঁদের নেই-ই; পরন্তু তাঁদের কোনরকম দুঃখ পাওয়াই স্বার্থপর মনের পরিচয়। তোমার নিজের বলতে সংসারে কিছুই থাকবে না?'

'ভালো করে' তুমি ভেবে দেখ বিভাস, এই প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাবার সাহস এবং শক্তি তোমার আছে কিনা!'

'দেখেছি ভেবে, বিশেষ আর ভাববার নেই কিছু। তুমি যদি আমায় সত্যিই ভালবাস তাহ'লে চল আজ চলে' যাই।'

'সত্যি তোমায় ভালবাসি এ-কথা তুমি কি জানো না, তা প্রমাণ করবার জন্যে কি কোন সর্ত্তের প্রয়োজন?'

'তবে চল আজ রাত্রে আমার সঙ্গে।'

মাধুরী উত্তর দিলে না, চুপ করে' রইলো।

চা তাদের ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগলো। আর বেশীক্ষণ রেস্তরাঁয় বসবার মাধুরীর সময় নেই। সময় তার অল্প। 'আমায় তুমি ক্ষমা কর বিভাস, সমাজকে এমন করে' আঘাত দেবার ক্ষমতা আমার নেই, যখনি মনে হয় চারপাশে শুধু নিন্দা, অপবাদ এবং ঘৃণা—আমার সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আমার মা, বাবা, ভাই, বোন এদের কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে'?'

'তবে এসো না কেন বিয়ে করি।'

'যদি সামাজিক রীতি অনুসারে এবং বাপ-মার সম্মতির অনুকূলে বিয়ে সম্ভব হ'ত!'

'তার মানে?' উদ্ধত বিভাসের গলার স্বর।

'কেউ রাজী হবে না।' মাধুরী বলে।

'চুলোয় যাক না কেউ, তুমি ত রাজী আছো?

'আমি ত আমি নই, সামাজিক সমষ্টির অংশ।'

বিভাস হেসে ফেললে, 'ও হ'ল সমাজ-বিজ্ঞানের কথা, মনোবিজ্ঞান কি বলে?'

'সে ত তুমি জানো।'

এর পর কথাবার্ত্তা এগোয় না; মাধুরী যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। বিভাস তাকে বাসে তুলে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বৈড়ালো গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত।

কিন্তু বিভাস তবু ক্ষান্ত হয় নি। কি জানি, কোন মুহূর্ত্তে মাধুরী হয়তো রাজীও হয়ে যেতে পারে।

এক সন্ধ্যায় সে জলপাইগুড়ির দু'খানা টিকিট কিনে নিয়ে হাজির। মাধুরীকে যেমন করে'ই হোক তার সঙ্গে আজ রাত্রে পালাতে হবে; যেমন করেই হোক, বিছানাপত্র, কাপড়-জামা কিছু নিতে হবে না। শুধু সে গেলেই হবে।'

মাধুরী অবাক হয়ে গেল, বিভাসকে তার মনে হ'ল প্রতিজ্ঞার একটা কঠিন রেখা।

'এমন করে' জীবনটা বৃথা যেতে দিতে পারিনা মাধুরী, বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, একদিন নিজেদের অজ্ঞাতসারে দেখবো নিস্তেজ হয়ে পড়েছি, শিথিল হয়ে এসেছে শরীরের সমস্ত রক্ত, নেই সেই উন্মাদনা। বলি শোন, তোমার পড়বার টেব্‌লে একখানা চিঠিতে সমস্ত জানিয়ে এসো, ভেসে পড়ি। এখনও জোয়ার রয়েছে, অক্লেশে ভেসে যেতে পারবো, শেষকালে একদিন ভাঁটা পড়বে যৌবন-নদীতে, জল থাকবে না বিন্দুমাত্র; তখন কাদাতেই পড়ে' থাকতে হবে, নড়বার পর্য্যন্ত কোন উপায় থাকবে না। এখন পাঁচটা, এখনও অনেক সময় আছে আমাদের হাতে—যদি তোমার কিছু গুছিয়ে নেবার থাকে, বাকি পড়ে' থাকে কোন কাজ।'

'গুছিয়ে নেবার কিছু নেই,' মাধুরী বলে, 'শুধু তোমায় আর একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।'

'ভেবেছি, যথেষ্ট ভেবেছি, আর ভাববার নেই কিছু, চল, চলে' যাই, তোমাকে আমার প্রয়োজন, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন।'

'আমার জীবনও কিছু অর্থপূর্ণ নয়, আমি চাই তোমার ভালবাসা—পৃথিবীর সব-কিছুর বিনিময়ে; কিন্তু তবু আমার মনে হয় আর একবার ভেবে দেখবার দরকার আছে বিভাস; দেরী হয়ে গেলে আর ফেরবার সময় বা পথ থাকবে না।'

'আমি ভেবেছি, ফেরবার পথের আর আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের দরকার শুধু এগিয়ে যাবার—চল, চল আজ মাধুরী! এমন করে' জীবন ধারণ করা যায় না!'

মাধুরী কয়েক মিনিট চুপ করে' থেকে উত্তর দিলে, 'এখনও সময় আছে, আমাকে কিছু ভাবতে দাও একা একা, যখন তোমার কাছে থাকি—আমার নিজের ভাববার কিছু থাকে না, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তোমার কথার ঘায়ে আমি খান্ খান্ হয়ে যাই। চল বাড়ী ফিরি, ট্রেনের এখনও অনেক সময় আছে, আসবো আমি, ষ্টেশনে অপেক্ষা কোরো আমার জন্যে!'

ব্যাপারটার সভ্যতা উপলব্ধি করে' বিভাস স্তব্ধ হয়ে বসে' রইলো, মাধুরী রাস্তায় এলো।

আর বিশেষ দেরী নেই ট্রেণ ছাড়বার; মাধুরী এখনও এসে পৌছালো না; মাধুরী ত জানে ট্রেণের সময়, সে ত বিশেষ করে' বলে' দিয়েছে। ইন্টার ক্লাসের একটা অপেক্ষাকৃত খালি কামরায় দুটো পাশাপাশি বেঞ্চি দখল করে' রেখেছে। মেয়েদের কামরায় আলাদা গিয়ে আর লাভ কি? দু'জনে বেশ গল্প করে' সময় কাটিয়ে দিতে পারবে।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। আর কয়েক মিনিট মাত্র দেরী। দেখা গেল দূরে লোকের ভিড়ে মাধুরীর সাড়ীর পাড়, কাপড়খানা সে বদলায়নি পর্য্যন্ত! একখানা চাদর পর্য্যন্ত গায়ে নেই, সঙ্গে নেই কোনো কুলি, কোনো জিনিষপত্র।

'শোন—' মাধুরী কাছে এসে বললে, 'তোমার জিনিষগুলো নামিয়ে নাও, যাওয়া হ'ল না!'

বিভাস বোকার মত মাধুরীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইলো।

'আর ত সময় নেই, এখুনি গাড়ী ছাড়বে' মাধুরী আবার বল্‌লে, 'সুটকেশটা আর বিছানাটা নামিয়ে নাও।'

'তুমি যাবে না?' এতক্ষণ পরে বিভাস বলতে পারলে।

'না, যাওয়া হ'ল না, আমি পারলাম না, তুমি আমার অপরাধ নিও না বিভাস, আমার সাহস নেই বলে' আমি তোমার কাছে লজ্জিত, ভেবে দেখলাম—আমি পারবো না।'

গার্ড বাঁশী বাজালে, নড়তে লাগলো তার নীল লণ্ঠনের আলো।

বিভাস এক লাফে গাড়ীতে উঠে কোনরকমে মালপত্র নিয়ে প্লাটফরমে নেমে পড়লো। ট্রেণ ছাড়লো; বিভাস অবাক বিস্ময়ে অপসৃয়মান ট্রেণের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

'এসো, বিছানাটা ধর বেঁধে নিই।'

বিভাস বিছানা বাঁধবার জন্যে এগিয়ে এলো।

কয়েক মাস কেটে গেল।

পালিয়ে যাবার আশা বিভাস ত্যাগ করেছে, কেন না, তাতে সম্মতি মাধুরী কখনও দেবে না। করবার কিছু নেই; উপায় নেই কোনো। বিভাস ভাগ্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল, শান্ত হ'ল তার হৃদয়ের উন্মাদনা। কখনও কখনও নানা কাজকর্ম্মের ফাঁকে মাধুরীর সঙ্গে একা থাকবার, কোন দূর দেশে তার সঙ্গে একা পালিয়ে যাবার সম্ভাবনায় সে চঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু সে শুধু কয়েক মুহূর্ত্তের পাগলামি, রক্তস্রোত স্বাভাবিক হতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগতো। কাজে মন দেবার চেষ্টা করতো সে, পৃথিবীতে সব ভালবাসাই আর সফল হয় না; কিন্তু দুঃখ, এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম হতে বিলম্ব ঘটে যখন ফেরবার আর কোন উপায়ই থাকে না, মনকে ফেরাবার দু'পক্ষ থেকেই আর কোন সামর্থ্য থাকে না। যদিও এ-কথাও তারা জানে যে কখনও দু'জন পরস্পরকে পাবে না তবুও ভুলতে পারে না তারা, মানুষ এমনি দুর্ব্বল। বিভাস চেষ্টা করে দূরে সরে' যাবার, মাধুরী চেষ্টা করে কাছে না আসবার।

আমরা চাই দূরে যাবার, অনেক দূরে; চাই ভুলে থাকতে, কিন্তু দুঃখ কোন স্থান বেষ্টন করে' নয়, দুঃখ আমাদের মনে।

বিভাস যথারীতি অফিস করে, কলম চালায়। সিনেমা দেখে, উপন্যাস পড়ে, বাড়ী ফেরে গভীর রাত্রে। কিন্তু কোথায় যেন তার বাধ্যবাধকতা আছে, ঋণের বোঝা নামিয়ে পরিপূর্ণ মুক্তির স্বাদ সে অনুভব করতে পারে না। পারবে না কোনদিন।

সেদিন শনিবার। নিজের চেয়ারে বসে' কলম চালাচ্ছিল। বেয়ারা এসে খবর দিলে তাকে টেলিফোনে কে ডাকছে! তাকে? বিভাসের রক্ত উঠ্‌ল জোয়ার। নিশ্চয় মাধুরী নয়, কলমটা সে যথাস্থানে রেখে উঠে দাঁড়ালো, তবে আর কে তাকে ডাকতে পারে, সে চেয়ার সরালে, কত লোক আছে তাকে ডাকবার, সে যেন হাওয়ায় উড়ে এলো রিসিভারের কাছে, নিশ্চয় মাধুরী নয়, সে ত এম-এ পরীক্ষার পড়া তৈরী করছে এখন। মাধুরীর হঠাৎ এ অসময়ে তাকে মনে পড়বার কি কারণ ঘটলো? মাধুরী নয় নিশ্চয়ই।

'হ্যালো! কে?'

'আমি মাধুরী, কি করছিলে?'

'কলম চালাচ্ছিলাম' বিভাসের কপালে ঘাম দেখা দিল।

'চালাচ্ছিলে না কামড়াচ্ছিলে? শোন, সন্ধ্যে সাতটায়—হ্যালো! সন্ধ্যে সাতটায় তোমার জিনিষপত্র নিয়ে হাঁওড়া এনকোয়ারি অফিসের সামনে দাঁড়াবে, সাতটায়, আজ—এখুনি বেরিয়ে পড় আফিস থেকে যদি কিছু কেনবার থাকে, কোন ব্যবস্থা করবার থাকে—কোথায় যাবো? যেখানে হয়, আর ভাববার সময় নেই, অপেক্ষা করবার সময় নেই; বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। না, বাড়ীতে আর কি হবে! সবাইর সেই এক চিন্তা, চাকুরী করে' টাকা রোজগার করবো। আমার যেন নিজের ঘর থাকতে পারে না, সংসার থাকতে পারে না; কি ভীষণ স্বার্থপর প্ল্যান ভাবো একবার। শোন, চাই'লে এসো! আচ্ছা!'

বিভাস রিসিভার রেখে যথাস্থানে ফিরে এলো।

মাধুরী সাতটার আগেই এসে পৌছেছে। এন্‌কোয়ারী অফিসের আশে-পাশে সে তাকালে; না, বিভাস এখনও আসেনি, মালপত্র নামিয়ে রেখে কুলিকে অপেক্ষা করতে বলে' সে বই-এর দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। দু'খানা ইংরেজী উপন্যাস কিনলে, বিভাসের বই-এর নেশা আজও কমে-নি।

সাতটা বাজতে তিন মিনিট, বিভাস এলো না এখনও। সুটকেসের ওপর বসে' সে একখানা উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করলে।

মাধুরী ভাবছিলো: 'তুমি দেরী করে' আস, তাই আমার লাভ!' বিভাস একদিন বলেছিলো!

'কিসের লাভ?'

'তোমার জন্যে অস্থিরতা আমার বেড়ে যায়। তোমাকে পাবার কামনা হয় সীমাহীন!'

কিন্তু আজ আর বিভাসের বিশেষ কাব্য করবার সুবিধে হবে না! দূরে দেখা গেল বিভাস আসছে দ্রুত পদক্ষেপে! বই বন্ধ করে' মাধুরী উঠে দাঁড়ালো। তার দুই চোখে ঝলসালো আনন্দের বিদ্যুৎ, তার সমস্ত ভঙ্গিতে আহ্বানের ইঙ্গিত।

'তোমার জিনিষপত্র কৈ?' মাধুরী বিস্মিত না হয়ে পারলে না।

'যাওয়া হ'ল না, চল ফিরি!'

মাধুরীর মুখের সমস্ত আলো এক মুহূর্ত্তে নিবে গেল। স্তম্ভিত হ'ল সে। 'কিন্তু আমি যে চিঠি লিখে এসেছি টেব্‌লের ওপর, সে-চিঠি কি এতক্ষণ কারুর হাতে পড়েনি?' প্রায় আপন মনেই সে বলে' উঠলো। তারপর হঠাৎ—'কিন্তু এর মধ্যে কি হ'ল আবার? আমি যে সব ঠিক করে' ফেলেছি! আমার যে আর ফেরবার উপায় নেই।'

'আছে, থাকবে না কেন?' বিভাস বললে, 'চল, এসো, একটা ফিটন নেয়া যাক্‌।'

মাধুরী কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্‌ বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর বললে, 'চল, দেখ আমার কুলিটা কোথায় গেল! ফিটন কোথায় যাবে?'

'গঙ্গার ধারে,' বিভাস বললে, 'আউট্রাম ঘাটে!'

'মেঘ করেছে না? বৃষ্টি আসতে পারে।'

'ভালোই ত! তুমি ত ভিজতে ভালোবাসো। অত ভেজা কিন্তু ভালো নয়; তোমার হাঙ্গেরিয়ান ব্লাউজটা পরনি কেন? বেশ মানায়!'

সম্পাদক: বিরাম মুখোপাধ্যায়
১৩নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ৭।১, পটুয়াটোলা লেনের 'ইওং প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর: বিরাম মুখোপাধ্যায়

" সাথি "
শিল্পী—আইডেন রিভেরা